তাকদীর তামাশা

তাকদীর প্রসঙ্গে ইসলাম যা বলে

আয়েশা বিনতে আলীম

উৎসর্গ

জীবিত ও মৃত পৃথিবীর সকল মুক্ত চিন্তকদের প্রতি

যারা তাদের মূল্যবান মেধা শ্রম ও জীবন দিয়ে

মানুষকে ভাবতে উদ্ভুদ্ধ করেছে

সূচিপত্র

……………………

১. ভূমিকা...... ৭

২. তাকদীরের সংজ্ঞা...... ৮

৩. আনাম : ৫৯ – আল্লার অজান্তে একটি পাতাও পড়ে না...... ৯

৪. মিশকাত - তাকদীর নির্ধারণের সময় ১১

৫. কামার : ৪৯ – সব কিছু সৃষ্টি কদর বা তাকদীর অনুসারে হয়.... ১১

৬. মিশকাত - সব তাকদীর অনুসারে হয়....... ১৪

৭. মিশকাত – ভাল মন্দ যা করছি তা পূর্বেই ফিক্সড ১৫

৮. আনাম : ১১২ – নবীদের শত্রু ও তাকদীর ১৫

৯. মিশকাত – প্রত্যেকের সাথেই শয়তান নিযুক্ত ১৬

১০. আরাফ : ১৭৮ – যাদের বিপথগামী করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত ১৭

১১. মিশকাত – তাকদীর লেখার কলম শুকিয়ে গেছে ১৮

১২. তাকদীর কি পরিবর্তন করা যায় ? ১৮

১৩. ওমরের গর্দান উড়িয়ে দেয়ার ইচ্ছা ২০

১৪. কাহফ : ১৭ – যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান সে ই পথচ্যুত ২১

১৫. আলা : ৩ – আল্লা তাকদীরের দিকে মানুষকে পরিচালিত করেন ২১

১৬. ত্বহা : ৫০ – আল্লা তাকদীরের দিকে চলার পথ দেখান ২২

১৭. ইব্রাহিম : ৪ – যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন ২৩

১৮. ইব্রাহিম : ২৭ – কাউকে কাউকে ইমান গ্রহণের সুযোগ দেন না ... ২৪

১৯. মিশকাত – হে নবী , আমলের মূল্য কি রইল ? ২৬

২০. হাদিদ : ২১ – বান্দার আমল বা কর্ম অকেজো ২৭

২১. গর্ভে ৪০ দিন ও তাকদির , তার জন্য সহজ করে দেয়া হয়েছে …… ২৮

২২. যিনা ব্যভিচার ও তাকদীর ……… ২৯

২৩. আদম – মুসার তর্ক ও তাকদীর ………… ৩০

২৪. মুজাদালা : ১০ – আল্লার অনুমতিতে শয়তান ক্ষতি করে …… ৩১

২৫. হিজর : ৩৯ – ইবলিশ ও তাকদীর ………………… ৩২

২৬. মিশকাত – আল্লা অন্তর পরিবর্তনকারী…………… ৩৩

২৭. দাহর : ৩০ – ইচ্ছা করিবে না , যদি না আল্লা ইচ্ছা করে …… ৩৩

২৮. তাকভীর : ২৯ - ইচ্ছা করিবে না , যদি না আল্লা ইচ্ছা করে …… ৩৪

২৯. মুদদাছছির : ৫৬ – আল্লার ইচ্ছা ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না …… ৩৫

৩০. কাহাফ : ২৮ – এত এত মন্দ কাজের স্রষ্টা কে ? ……… ৩৬

৩১. মানুষ কেন মন্দ কর্মের জন্য দায়ী ? ………. ৩৭

৩২. মায়েদা : ৪১ – কুফরীও আল্লার অভিপ্রায় …………. ৩৮

৩৩. ইয়াসিন : ১২ – যা হয়েছে , যা হবে সব লিপিবদ্ধ ………. ৩৯

৩৪. সূরা ইসরাইল : ১৬ – অসৎ অনুবাদ এবং নাফরমানির হুকুম …… ৩৯

৩৫. হাজ্জ : ৭০ – আসমান জমিনে যা ঘটবে সব তাকদীরে লেখা …… ৪৪

৩৬. হিজর : ২১ – অদৃষ্টলিপি অনুসারেই অস্তিত্ব দান …… ৪৫

৩৭. ফুরকান : ২ – অস্তিত্ব প্রাপ্তির পূর্বেই তাকদীর বাস্তবায়িত হয়ে চলেছে …… ৪৬

৩৮. ফাতির : ৮ – আল্লাই মন্দ কাজ শোভন করে দেখান ……… ৪৬

৩৯. কালাম : ১ – শপথ কলমের , অনন্ত কালের সম্ভাব্য ঘটনা লিখিত …… ৪৭

৪০. সাফফাত : ৯৬ – আল্লা মানুষের কাজ কর্মের স্রষ্টা …… ৪৮

৪১. যুমার : ৬২ – আল্লা স্রষ্টা এবং তত্ত্বাবধায়ক ………… ৪৯

৪২. হাদীদ : ২২ – বিপদাপদ পূর্বেই তাকদীরে লেখা ……… ৪৯

৪৩. মুমিনুন : ৬৩ – খারাপ কাজও ফিক্সড কিন্তু নবী তাকদীরের দোহায় অপছন্দ করে … ৫০

৪৪. বাকারা : ১০২ – আল্লার অনুমতিতেই শয়তান মানুষের ক্ষতি করে ৫১

৪৫. হা মিম সাজদা : ২৫ – শয়তানকে করেছে সহচর ৫২

৪৬. ইয়াসিন : ৭ – ইমান না আনাটাও তাকদীরে লেখা ৫২

৪৭. সাজদাহ : ১৩ – আল্লা ইচ্ছা করলে সবাই ইমান আনত ৫২

৪৮. ইউনুস : ৯৬ – আল্লার নির্ধারণেই কেউ কেউ ইমান হারা ৫৩

৪৯. সাফফাত : ৩০-৩১ – পথভ্রষ্টতা ভাগ্যের ফের ৫৩

৫০. যুমার : ১৯ – আল্লার নির্ধারণেই লাহাব দোযখে ৫৪

৫১. আনাম : ১০৭ – আল্লা চাইলে তারা শিরক করত না ৫৪

৫২. বাকারা : ২৪৩ – মহামারীও পূর্বে নির্ধারিত ৫৫

৫৩. আরাফ : ৩০ – একদলের উপর ভ্রান্তি নির্ধারিত ৫৬

৫৪. আরাফ : ১৪৫ – সর্ব বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছে ৫৭

৫৫. ইউনুস : ৯৯ – ইচ্ছা করলে সবাই ইমান আনত ৫৮

৫৬. হুদ : ১০৫ – কেউ হবে হতভাগ্য , ভাল কাজ করতে চাইবে না ৫৯

৫৭. রাদ : ১১ – আল্লার অশুভ ইচ্ছা রদ করার কেউ নেই ৬১

৫৮. রাদ : ৩৮ – প্রত্যেক বিষয়ের সময় নির্ধারিত ৬৩

৫৯. রাদ : ৩৯ – আল্লা যা ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত রাখেন , তাকদীর ৬৪

৬০. মিশকাত – পিতার পৃষ্ঠদেশে থাকতেই জাহান্নামী ৬৪

৬১. কলম ভবিষ্যতের সব লিখে ফেলেল ৬৫

৬২. এই কিতাবে জান্নাতি , এই কিতাবে জাহান্নামী ৬৫

৬৩. তাকদীর নিয়ে তর্ক , নবী রাগে লাল ৬৬

৬৪. সৃষ্টির সময় আল্লার নূর বন্টনে বৈষম্য ৬৭

৬৫. মুমিন হওয়ার চার শর্ত ৬৮

৬৬. তাকদীর অস্বীকার , চেহারা বিকৃতি ৬৮

৬৭. তাকদীর অস্বীকারকারীর জানাযায় যেও না ৬৮

৬৮. মৃত্যুর জায়গা ও প্রয়োজন নির্ধারিত ৬৯

৬৯. দুনিয়ায় ভিক্টিম হলেও সাজা ৬৯

৭০. আমল বা কর্ম তাকদীরে চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত ৭০

৭১. ব্যক্তি তাই করে , যার জন্য সে সৃষ্ট ৭০

৭২. তাকদীর ও প্রচেষ্টাবিহীন পিতা ৭০

৭৩. যা পয়দা হওয়ার তা হবেই , জন্মনিরোধে নিরোৎসাহি করণ ৭১

৭৪. মানুষ যিনার হিস্যা অবশ্যই পাবে ৭১

৭৫. অনুমতি দিন তার মুণ্ডপাত করে দিই ৭১

৭৬. প্লেগ , আযাব , রহমত , ভাগ্য ব্যতিত স্পর্শ করে না ৭২

৭৭. বান্দা জরায়ুতেই দুর্ভাগা বা গুনাহগার হয় ৭২

৭৮. মানুষ জন্মগতভাবেই কাফির হয় ৭৩

৭৯. কর্ম আগে থেকেই নির্ধারিত ৭৪

৮০. ছোঁয়াচে রোগ নেই , বিপদ লিপিবদ্ধ ৭৪

৮১. তাকদীরে অবিশ্বাসী জাহান্নামী , আসমান-জমিন সৃষ্টির আগেই
ফিরাউন ও লাহাব যে জাহান্নামী তা তাদের তাকদীরে লেখা ছিল ৭৫

৮২. সাহাবীরাও কোরানের বৈপরিত্য পেত ৭৬

৮৩. তাকদীর অস্বীকার করায় বন্ধুত্ব খারাপ ৭৭

৮৪. তাকদীর মুসলিমদের অপদার্থ করেছে ৭৮

৮৫. আধুনিক শিক্ষিতদের জন্য ভিন্ন টেকনিক ৮০

৮৬. উটতুল্য মুমিন , শুনলাম আর মানলাম ৮০

৮৭. বেহেশ্ত দোযখে যাওয়ার প্রশ্নে ৮১

৮৮. রিযিক রহস্য ৮২

৮৯. আল্লার ইচ্ছায় কুফরী (ত্বহাবিয়া) ৮৪

৯০. তাকদীর অস্বীকার , ঘাড় মটকে ফেলব ৮৫

৯১. প্রথম শির্ক , একটি কোরানিক বৈপরিত্য ৮৫

৯২. ঐ ব্যক্তিই বড় কাফের যে মনে করে ৮৬

৯৩. তাকদীর নির্ধারিত এতে প্রমাণীত আল্লা সব জানেন ৮৭

৯৪. আল্লাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা কুফরী ৮৮

৯৫. খলিফা উমর ও চোর কাহিনী ৮৯

৯৬. আল্লা কর্মের স্রষ্টা আর বান্দা সম্পাদক ৯০

৯৭. তাকদীর নিয়ে এক আলেমের হয়রানি ও নানীর বাণী ৯১

ভূমিকা

জানার স্পৃহা মানুষকে করেছে অনন্য। সেই জানার বিষয় হোক বিজ্ঞান গণিত বা ধর্ম , মানুষ তার অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে আবিষ্কার করে চলেছে মূলত মানুষের চিন্তাকেই। আমরা এই লেখায় জানার চেষ্টা করব ইসলাম ধর্মের সবচেয়ে স্পর্শকাতর বিষয় তাকদীর বা ভাগ্য নিয়ে। সংশয় . কমের তাকদীর বিষয়ক লেখাটি পড়ে যখন কোরান হাদিসে সে সবের তথ্য যাচাই করতে গেলাম , দেখলাম এ নিয়ে আল্লাপাক আরো আয়াত নাজিল করেছে আর নবীর মূল্যবান আরো হাদিস রয়েছে। আর বিজ্ঞ আলেমরা সে সব তথ্যের ধর্ম বিশ্বাস সম্মত ব্যাখ্যা দিয়ে করে তুলেছে আরো প্রাঞ্জল। আমাদের অগ্রজ চিন্তকেরা বই পত্র ও ব্লগে তাদের মূল্যবান চিন্তাকে সাজিয়ে গেছেন যা থেকে জ্ঞানপিপাসু মানুষরা পেতে পারে বিপুল পরিমাণ যৌক্তিক চিন্তার রসদ। বিষেশ করে সংশয় , মুক্তমনা , ইস্টিশনের লেখাগুলো একপ্রকার জ্ঞানীয় অস্ত্র যা নিয়ত আঘাত হেনে চলেছে প্রথাগত জং ধরা সমাজের মস্তিষ্কে। আমাদের অগ্রজ চিন্তকদের শ্রম ত্যাগ জীবন যে বিফলে যাবার নয় , তাদেরই শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এই ক্ষুদ্র লেখাটির জন্ম। আজাদ , অভিজিৎ ,ওয়াশিকুরদের হত্যা করে মৌলবাদীরা কি সফল হতে পেরেছে ? চিন্তার মৃত্যু হয়েছে ? উত্তর হল না , কখনো এ আলো নিভবার নয়। যুক্তি প্রমাণের আলোকে আরো তীব্র করে আমাদের মাঝে আসতে থাকবে আরো অনেক আসিফ মহিউদ্দিন , গোলাপ মাহমুদ। ধর্ম কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে বের হতে হলে শুধু চাই একটু জানার স্পৃহা। যে স্পৃহা থেকেই এ লেখার শুরু। এ লেখায় যেসব ইসলামিক তথ্য তুলে আনা হয়েছে কোরান হাদিস ঘাটলে হয়ত এসব তথ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত তথ্যও পাবেন। খোদ সাহাবীরাই পেত ! যদি কোন উৎসুক পাঠক ওমন বিপরীত তথ্য পান তবে নিশ্চিত থাকুন আপনি আল্লা ও নবীর কথার বৈপরীত্যেরই খোজ পেয়েছেন। অন্ধ ধার্মিকেরা আল্লার মত অভিশম্পাত দিতে থাকুন আর জ্ঞানী যুক্তিবাদীরা জানতে ও জানাতে থাকুন সত্যকে।

--- আয়েশা বিনতে আলীম

ফরিদপুর , ২০২৪

তাকদীর প্রসঙ্গে ইসলাম যা বলে

....

তাকদীর প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রথমেই আমাদের জেনে নেয়া দরকার তাকদীর বিষয়টা বলতে ইসলামে আসলে কি বোঝায় । এর পর আমরা কোরানের বিভিন্ন আয়াত ও তার ব্যাখ্যা বা তাফসীর এবং প্রাসঙ্গিক হাদিসের আলোকে তাকদীরকে বোঝার চেষ্টা করব । হাদিস একাডেমী থেকে প্রকাশিত ২০১৩ সালের প্রথম সংস্করণের মিশকাতুল মাসাবিহর ৬৮ নং পৃষ্ঠা থেকে জেনে নেয়া যাকঃ

৬৮ তাহক্বীক্ব মিশকা-তুল মাসা-বীহ

(٣) بَابُ الْإِيْمَانِ بِالْقَدْرِ

অধ্যায়-৩ : তাক্বদীরের প্রতি ঈমান

ক্বাদর বা তাক্বদীর তাই যা আল্লাহ ফায়সালা করেছেন এবং কোন বিষয়ে নির্দেশ জারী করেছেন ।

তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনার অর্থ : এ বিশ্বাস রাখা যে, পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে তা ভাল হোক আর মন্দ হোক, ক্ষতিকর হোক বা উপকারী হোক তা' নির্ধারিত । এমনকি বান্দার কর্মকাণ্ড যার মধ্যে ঈমান আনা, কুফরী করা, আনুগত্য করা, অবাধ্য হওয়া, পথ ভ্রষ্ট হওয়া ও সৎ পথে চলা সব কিছুই আল্লাহর ফায়সালা । এসব তাঁরই নির্ধারণ, ইচ্ছা, সৃষ্টি ও প্রভাবের ফল । তবে তিনি ঈমান আনয়নে ও তাঁর আনুগত্যে সন্তুষ্ট হন এবং এজন্য তিনি প্রতিদানের অঙ্গীকারও করেছেন । পক্ষান্তরে কুফরী ও অবাধ্যতায় সন্তুষ্ট হন না বরং এজন্য তিনি শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন । আল্লাহ তা'আলা সবকিছু নির্ধারণ করেছেন । অর্থাৎ তিনি কোন কিছু অস্তিত্বে আনার আগেই তার পরিমাণ, অবস্থা ও তার অস্তিত্বে আসার কাল বা সময় সম্পর্কে অবহিত । অতঃপর তিনি তা অস্তিত্বে এনেছেন । অতএব ঊর্ধ্বজগতে বা অধঃজগতে আল্লাহ ব্যতীত কোন স্রষ্টা ও নির্ধারণকারী নেই । সবকিছুই তাঁর জ্ঞান, ক্ষমতা ও ইচ্ছানুযায়ী হয় । এতে সৃষ্টি জগতের কারো ইচ্ছা বা প্রভাব নেই ।

প্রাথমিক পরিচিতি বা সংজ্ঞা থেকে জানতে পারলাম তাকদীর হল তা ,যা আল্লা ফয়সালা করেছেন, নির্ধারিত করেছেন, ফিক্সড করেছেন । এমনকি বান্দার ঈমান আনা, কুফরি করা, অবাধ্য হওয়া সব কিছুই আল্লা ফয়সালা বা নির্ধারিত করে ফেলেছেন । কোন কিছুর অস্তিত্বে আসা অর্থাৎ কোন কিছু ঘটা এবং ঐ ঘটনা কি পরিমাণ ঘটবে তার পরিমাণ ও ঘটার সময় সম্পর্কে আল্লা অবহিত। শুধু যে অবহিত বা জানে তা শুধু নয়, আল্লাই তা অস্তিত্বে আনেন অর্থাৎ ঘটান। কারণ, সব কিছুই আল্লার জ্ঞান, ক্ষমতা ও ইচ্ছানুযায়ীই হয় !

কোরানের আনাম নামক সুরার ৫৯ নং আয়াতে (৬:৫৯) বলা হচ্ছেঃ

৫৯. আর গায়েবের চাবি তাঁরই কাছে রয়েছে[১], তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা জানে না। স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারসমূহে যা কিছু আছে তা তিনিই অবগত রয়েছেন, তাঁর অজানায় একটি পাতাও পড়ে না। মাটির অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণাও অংকুরিত হয় না বা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ۭ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۭ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝

তাফসীরে যাকারিয়া (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৫০) থেকে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা জেনে নেয়া যাকঃ

(১) কুরআনের পরিভাষায় গায়েবের জ্ঞান ও অসীম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার। উদাহারণতঃ কে কখন কোথায় জন্মগ্রহণ করবে, কি কি কাজ করবে, কতটুকু বয়স পাবে, কতবার শ্বাস গ্রহণ করবে, কতবার পা ফেলবে, কোথায় মৃত্যুবরণ করবে, কোথায় সমাধিস্থ হবে এবং কে কতটুকু রিয্ক পাবে, কখন পাবে, বৃষ্টি কখন, কোথায়, কি পরিমাণ হবে, অনুরূপভাবে স্ত্রী লোকের গর্ভাশয়ে যে ভ্রূণ অস্তিত্ব লাভ করেছে, কিন্তু কারো জানা নেই যে, পুত্র না কন্যা, সুশ্রী না কুশ্রী, সৎস্বভাব না বদস্বভাব ইত্যাদি বিষয়সমূহ যা সৃষ্ট জীবের জ্ঞান ও দৃষ্টি সীমা থেকে উহ্য রয়েছে। সুতরাং ﴿وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ﴾ এর অর্থ এই দাঁড়ালো যে, গায়েবী বিষয়ের ভাণ্ডার আল্লাহ্রই কাছে রয়েছে। কাছে থাকার অর্থ করায়ত্ত ও মালিকানায় থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, গায়েবী বিষয়ের ভাণ্ডারসমূহের জ্ঞান তাঁর করায়ত্ত এবং সেগুলোকে অস্তিত্ব দান করা অর্থাৎ কখন কতটুকু অস্তিত্ব লাভ করবে- তাও তাঁর সামর্থ্যের অন্তর্গত। কুরআনুল কারীমের অন্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ "প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার আমার কাছেই রয়েছে। কিন্তু আমি প্রত্যেক বস্তু একটি বিশেষ পরিমাণে নাযিল করি"। [সূরা আল-হিজর: ২১]

উক্ত আয়াত থেকে আমরা জানতে পারলাম , কে কি কি কাজ করবে সেটাতো তিনি জানেনেই শুধু তিনি জেনেই ক্ষান্ত নন, উপরন্তু সেই সকল কাজকে তিনি অস্তিস্ত্ব দান করেন অর্থাৎ কখন কে কোন কাজ কতটুকু করবে সেটাও তিনিই নির্ধারণ করেন।

উক্ত আয়াতটির শেষাংশ ব্যাখ্যায় তাফসীরে কাসিরে (৩ খন্ড, পৃঃ ৭৭৭) লেখা হয়েছেঃ

আলোচ্য আয়াতটির সর্বশেষ অংশ হইল এই ঃ

وَلاَ حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلاَرَطْبٍ وَّلاَيَابِسٍ اِلاَّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

অর্থাৎ 'মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণাও অংকুরিত হয় না অথবা সতেজ কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে নাই।'

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন হারিস হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন হারিস বলেন ঃ পৃথিবীর প্রতিটি বৃক্ষে, এমনকি সূঁচের ছিদ্রেও আল্লাহর নির্ধারিত ফেরেশতা রহিয়াছেন। তাহারা প্রতিটি বৃক্ষের তরতাজা হওয়া কিংবা শুকাইয়া যাওয়ার সময়টিও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......মালিক ইব্‌ন সাঈর হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (রা)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা দোয়াত ও লওহ সৃষ্টি করেন। অতঃপর তিনি উহাতে পৃথিবীর সৃষ্টিতব্য প্রতিটি বস্তুর কথা লিপিবদ্ধ করেন। এমনকি কে হালাল ভক্ষণ করিবে এবং কে হারাম ভক্ষণ করিবে, আর কে নেককার হইবে এবং কে বদকার হইবে, তাহাও লিপিবদ্ধ করা হয়। এই কথা বলিয়া তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلاَّيَعْلَمُهَا

অর্থাৎ 'তাঁহার অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না।'

উক্ত আয়াতের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম কে কি কি করবে, কখন করবে, কতটুকু করবে সবই আল্লা তার 'স্পষ্ট কিতাবে' অর্থাৎ লওহে মাহফুজে বা সংরক্ষিত ফলকে পৃথিবীর সৃষ্টিতব্য প্রতিটি বস্তুর কথা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন দোয়াত ও লওহ সৃষ্টির পরই। আল্লা প্রতিটি কাজ এতই সূক্ষ্মভাবে করেন যে সূচের ছিদ্রেও আল্লার নির্ধারিত ফেরেশতা রয়েছে আর কখন কোন গাছ বা পাতাটি শুকিয়ে যাবে তারও সময়টি লিপিবদ্ধ করা। এমনকি কে হারাম খাবে এবং কে বদকার বা গোনাহগার হবে সেটিও লেখা রয়েছে। প্রশ্ন হল কখন এসব লিপিবদ্ধ করা হল ?

একটি হাদিস থেকে আমরা জেনে নিই।

হাদিস গ্রন্থঃ মিশকাতুল মাসাবিহ

প্রকাশনিঃ আধুনিক প্রকাশনি (২০১২)

১ম খন্ড , তাকদিরের উপর ঈমান, পৃষ্ঠাঃ ৯৬ , হাদিস নং- ৭৩

প্রথম পরিচ্ছেদ

٧٣ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللّٰهُ مَقَادِيْرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ قَالَ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ - رواه مسلم

৭৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা আসমান ও জমিন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর আগে মাখলুকাতের তাকদীর লিখে রেখেছেন। তিনি আরো বলেছেন, (সেই সময়) আল্লাহর আরশ পানির উপর ছিলো (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে পঞ্চাশ হাজার বছর বলা হয়েছে। এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝায়নি, বরং দীর্ঘ সময় বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মাখলুক সৃষ্টির অনেক আগে সকলের তাকদীর লাওহে মাহফুজে লিখে দেয়া হয়েছে।

উক্ত হাদিসের আলোকে আমরা দেখতে পেলাম কোন কিছু সৃষ্টির অনেক আগেই আল্লা তার ভাগ্য লিখে ফেলেছেন। এখন কারো মনে প্রশ্ন আসতে পারে তাকদীর তো আল্লা লিখেছে ঠিক আছে, আমাদের সাথে যা যা হচ্ছে তা কি সেই তাকদীর অনুযায়ী হয় ? সূরা কামারের ৪৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা (তাফসীরে যাকারিয়া, ১ম খন্ড) থেকে জেনে নিইঃ

৫৪- সূরা আল-কামার পারা ২৭ ২৫২০ الجزء ٢٧ ٥٤ – سورة القمر

আস্বাদন কর।'

৪৯. নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে(১),

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾

(১) قدر বা 'কদর' শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিমাপ করা, কোন বস্তু উপযোগিতা অনুসারে পরিমিতরূপে তৈরি করা। [ফাতহুল কাদীর] এছাড়া শরী'আতের পরিভাষায় 'কদর' শব্দটি মহান আল্লাহ্‌র তাকদীর তথা বিধিলিপির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ

তফসীরবিদ বিভিন্ন হাদীসের ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতে এই অর্থই নিয়েছেন। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, কুরাইশ কাফেররা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে তাকদীর সম্পর্কে বিতর্ক শুরু করলে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। [মুসলিম:২৬৫৬] তাকদীর ইসলামের একটি অকাট্য আকীদা-বিশ্বাস। যে একে সরাসরি অস্বীকার করে, সে কাফের। উপরোক্ত আয়াত ও তার শানে নুযুল থেকে আমরা এর প্রমাণ পাই। তাছাড়া পবিত্র কুরআনের অন্যত্রও তাকদীরের কথা এসেছে, মহান আল্লাহ বলেনঃ "আর আল্লাহর নির্দেশ ছিল সুনির্ধারিত"। [সূরা আল-আহযাবঃ ৩৮] অন্যত্র বলেন, "তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন তারপর নির্ধারণ করেছেন যথাযথ অনুপাতে"। [সূরা আল-ফুরকানঃ২] সহীহ মুসলিমে উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা 'হাদীসে জিবরীল' নামে বিখ্যাত, তাতে রয়েছেঃ জিবরীল আলাইহিস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জানতে চেয়ে বলেন যে, আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন, তিনি বললেনঃ "আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশ্‌তাগণের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনা, আর তাকদীরের ভাল ও মন্দের প্রতি ঈমান আনা"। [মুসলিম:১] অনুরূপভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনুল 'আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ "আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি জগতের তাকদীর লিখে রেখেছেন"। বললেনঃ "আর তাঁর আরশ ছিল পানির উপর"। [মুসলিম:২৬৫৩] অনুরূপভাবে তাকদীরের উপর ঈমান আনা উম্মাত তথা সাহাবা ও তাদের পরবর্তী সবার ইজ্‌মা' বা ঐক্যমতের বিষয়। সহীহ মুসলিমে ত্বাউস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ 'আমি অনেক সাহাবীকে পেয়েছি যারা বলতেনঃ সব কিছু তাকদীর অনুসারে হয়'। আরো বলেনঃ আমি 'আব্দুল্লাহ ইবনে উমরকে বলতে শুনেছিঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "সবকিছুই তাকদীর মোতাবেক হয়, এমনকি অপারগতা ও সক্ষমতা, অথবা বলেছেনঃ সক্ষমতা ও অপারগতা"। [মুসলিম:২৬৫৫]

তাকদীরের স্তর বা পর্যায়সমূহ চারটি; যার উপর কুরআন ও সুন্নায় অসংখ্য দলীল-প্রমাণাদি এসেছে আর আলেমগণও তার স্বীকৃতি দিয়েছেন।

প্রথম স্তরঃ অস্তিত্ব সম্পন্ন, অস্তিত্বহীন, সম্ভব এবং অসম্ভব সবকিছু সম্পর্কে আল্লাহর

জ্ঞান থাকা এবং এ সবকিছু তাঁর জ্ঞানের আওতাভুক্ত থাকা। সুতরাং তিনি যা ছিল এবং যা হবে, আর যা হয় নি যদি হত তাহলে কি রকম হতো তাও জানেন। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণীঃ "যাতে তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং জ্ঞানে আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন"। [সূরা আত্তালাকঃ ১২] সহীহ বুখারী ও মুসলিমে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীসে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ "তারা কি কাজ করত (জীবিত থাকলে) তা আল্লাহই ভাল জানেন'"। [বুখারী:১৩৮৪, মুসলিম: ২৬৫৯]

দ্বিতীয় স্তরঃ ক্বিয়ামত পর্যন্ত যত কিছু ঘটবে সে সব কিছু মহান আল্লাহ কর্তৃক লিখে রাখা। মহান আল্লাহ বলেনঃ "আপনি কি জানেন না যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন। এসবই এক কিতাবে আছে; নিশ্চয়ই তা আল্লাহর নিকট সহজ। [সূরা আল- হাজ্জঃ৭০] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ "আমরা তো প্রত্যেক জিনিস এক স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত করেছি"। [সূরা ইয়াসীনঃ১২] পূর্বে বর্ণিত 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনুল 'আসের হাদীসে এ কথাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি জগতের তাকদীর লিখে রেখেছেন। [মুসলিম:২৬৫৩] তাছাড়া অন্য হাদীসে এসেছে, ওলীদ ইবনে উবাদাহ বলেন, আমি আমার পিতাকে অসিয়ত করতে বললে তিনি বললেন,

'আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ যখন প্রথমে কলম সৃষ্টি করলেন তখন তাকে বললেন, লিখ। তখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যা হবে সে মূহূর্ত থেকে কলম তা লিখতে শুরু করেছে।' হে প্রিয় বৎস! তুমি যদি এটার উপর ঈমান না এনে মারা যাও তবে তুমি জাহান্নামে যাবে। [মুসনাদে আহমাদ:৫/৩১৭] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ঐ পর্যন্ত কেউ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ চারটি বিষয়ের উপর ঈমান না আনবে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন হক্ব ইলাহ্ নেই এটার সাক্ষ্য দেয়া। আর আমি আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহ্ আমাকে হক সহ পাঠিয়েছে। অনুরূপভাবে সে মৃত্যুর উপর ঈমান আনবে। আরো ঈমান আনবে মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানের। আরও ঈমান আনবে তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর। [তিরমিযী: ২১৪৪]

তৃতীয় স্তরঃ আল্লাহর ইচ্ছাঃ তিনি যা চান তা হয়, আর যা চান না তা হয় না। মহান আল্লাহ বলেনঃ "তাঁর ব্যাপার শুধু এতটুকুই যে, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তিনি তখন তাকে বলেনঃ 'হও', ফলে তা হয়ে যায়"। [সূরা ইয়াসীনঃ ৮২] মহান আল্লাহ্ আরো বলেনঃ "সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তোমরা কোন ইচ্ছাই করতে পার না"। [সূরা আত-তাকওয়ীরঃ ২৯] হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "তোমাদের কেউ যেন একথা কখনো না বলে যে, হে আল্লাহ! যদি আপনি চান আমাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! যদি আপনি চান আমাকে দয়া করুন, বরং দো'আ করার সময়

দৃঢ়ভাবে কর; কেননা আল্লাহ যা ইচ্ছা তা-ই করেন, তাঁকে জোর করার কেউ নেই" ।[বুখারী:৬৩৩৯, মুসলিম: ২৬৭৯]
চতুর্থ স্তরঃ আল্লাহ কর্তৃক যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করা ও অস্তিত্বে আনা এবং এ ব্যাপারে তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা থাকা। কেননা তিনিই সে পবিত্র সত্তা যিনি সমস্ত কর্মী ও তার কর্ম, প্রত্যেক নড়াচড়াকারী ও তার নড়াচড়া, এবং যাবতীয় স্থিরিকৃত বস্তু ও তার স্থিরতার সৃষ্টিকারক। মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর কর্মবিধায়ক"। [সূরা আয-যুমারঃ৬২] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ "প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা কর তাও"। [সূরা আস-সাফফাতঃ ৯৬] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "একমাত্র আল্লাহ ছিলেন, তিনি ব্যতীত আর কোন বস্তু ছিলনা, আর তাঁর আরশ ছিল পানির উপর এবং তিনি সবকিছু লাওহে মাহফুজে লিখে রেখেছেন, আর আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন"।[বুখারী: ৩১৯১]
তাই তাকদীরের উপর ঈমান বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য এ চারটি স্তরের উপর ঈমান আনা ওয়াজিব। যে কেউ তার সামান্যও অস্বীকার করে তাকদীরের উপর তার ঈমান পূর্ণ হবে না।

একটি হাদিস থেকে দেখে নেয়া যাক।

হাদিসগ্রন্থঃ মিশকাতুল মাসাবিহ, আধুনিক প্রকাশনি (২০১২),

১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৯৬ , হাদিস নং – ৭৪

٧٤. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزَ وَالْكَيْسَ . رواه مسلم

৭৪। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেকটি জিনিসই তাকদীর অনুযায়ী হয়, এমনকি বুদ্ধিমত্তা ও নির্বুদ্ধিতাও (মুসলিম)।

হাদিস একাডেমি থেকে প্রকাশিত মিশকাতুল মাসাবিহ গ্রন্থের ১ম খন্ডের ৬৯ নং পৃষ্ঠায় হিসামুদ্দিন আর রাহমানি আল মুবারকপুরী উক্ত হাদিসটির ব্যাখ্যা করেছে নিম্মুক্তভাবেঃ

ব্যাখ্যা : حَتّٰى الْعَجْزِ وَالْكَيْسِ অর্থাৎ বুদ্ধিমত্তা ও অপারগতা– এ দু'টিও আল্লাহর তাক্বদীর অনুযায়ী হয়ে থাকে। অর্থাৎ বান্দার উপার্জন ও কাজকর্মের বিষয়ে তা' শুরুর ব্যাপারে ইচ্ছা বা অবগতি থাকলেও তা আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তাদের দ্বারা সম্পাদন হয় না। সবকিছুই স্রষ্টার নির্ধারণ বা তাক্বদীর অনুযায়ীই হয়। এমনকি বুদ্ধিমত্তা যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি তার অভিষ্ঠ লক্ষে পৌঁছে অথবা অপারগতা যার কারণে তার অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছতে বিলম্ব ঘটে বা পৌঁছতে পারে না এটিও আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত।

এই মর্মে আরেকটি হাদিস , মিশকাত , হাদিস একাডেমি (২০১৩), ১ম খন্ড

৮৭। 'ইমরান ইবনু হুসায়ন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। মুযায়নাহ্ গোত্রের দুই লোক রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি মনে করেন, মানুষ এখন (দুনিয়াতে) যা 'আমাল (ভাল-মন্দ) করছে এবং 'আমাল করার চেষ্টায় রত আছে, তা আগেই তাদের জন্য তাক্বদীরে লিখে রাখা হয়েছিল? নাকি পরে যখন তাদের নিকট তাদের নাবী শারী'আহ্ (দলীল-প্রমাণ) নিয়ে এসেছেন এবং তাদের নিকট তার দলীল-প্রমাণ প্রকটিত হয়েছে, তখন তারা তা করছে? উত্তরে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : না, বরং পূর্বেই তাদের জন্য তাক্বদীরে এসব নির্দিষ্ট করা হয়েছে ও ঠিক হয়ে রয়েছে। এ কথার সমর্থনে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন (অনুবাদ) : "প্রাণের কসম (মানুষের)! এবং যিনি তাকে সুন্দরভাবে গঠন করেছেন এবং তাকে (পূর্বেই) ভাল ও মন্দের জ্ঞান দিয়েছেন"– (সূরাহ্ আল লায়ল ৯২ : ৭-৮)।[১০৬]

ব্যাখ্যা : أَشَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ আপনি আমাদের অবহিত করুন মানবজাতি ভাল-মন্দ যে কাজ করে তা-কি তাদের জন্য যেভাবে ফায়সালা করা হয়েছে সে অনুযায়ী করে? আর তা তাদের জন্য নির্ধারিত সময়ে তা সংঘটিত হয়? নাকি তা তাদের জন্য ফায়সালাকৃত নয়? বরং সকল কাজই সংঘটিত হয় ভবিষ্যতে যা সে সম্পাদন করতে চায় সে চাহিদা অনুযায়ী তাক্বদীর অনুযায়ী না হয়ে?

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যা কিছু ঘটে তা পূর্ব নির্ধারিত তাক্বদীর অনুযায়ীই ঘটে থাকে।

এই হাদিস থেকে জানতে পারলাম যা যা হয় সব তা আল্লার ইচ্ছায় তাকদীর অনুসারেই হয়।

এবার সূরা আনাম (৬:১১২) থেকে তাকদীর বা ভাগ্য সম্মন্ধে জানা যাক।

১১২. এইরূপ আমি প্রত্যেক নবীর জন্য মানব ও জিনের মধ্য হইতে শয়তানদিগকে শত্রু করিয়াছি, প্রতারণার উদ্দেশ্যে তাহাদিগের একে অপরকে মিথ্যা ও চমকপ্রদ বাক্য দ্বারা প্ররোচিত করে : যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন তবে তাহারা ইহা করিত না; সুতরাং তুমি তাহাদিগকে এবং তাহাদিগের মিথ্যা রচনাকে বর্জন কর।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর ইবনে কাসিরের ৪র্থ খন্ডের ২৫ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেঃ

وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ আয়াতাংশের মর্ম হইতেছে এই যে, প্রত্যেক নবী-রাসূলের জন্য ইহাদের মধ্যে হইতে শত্রু হওয়াটা আল্লাহ্ পাকের আদি ফায়সালা ও ইচ্ছার ভিত্তিতেই হয়। আল্লাহ্র এরূপ মর্যী না থাকিলে উহারা তাহাদের শত্রু হইতে পারিত না। অতএব তুমি উহাদিগকে বর্জন কর। উহারা যাহা কিছু মিথ্যা রচনা করিতেছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিবে না। সর্ব ব্যাপারেই আল্লাহ্র প্রতি ভরসা রাখ, আল্লাহ্ তা'আলাই তোমার জন্য যথেষ্ট। তিনি তোমাকে উহাদের উপর বিজয়ী করিবেন।

এই আয়াত থেকে জানলাম যে বা যারা নবীদের শত্রু হয় , তারা আল্লার 'আদি ফয়সালা' বা তাকদীর ও আল্লার ইচ্ছাতেই নবীদের শত্রু হয়। অর্থাৎ শত্রুরা আল্লার ইচ্ছাতেই নবীদের শত্রুতা করেছিল। আল্লা যদি নবীদের জন্যই ইচ্ছা করে শত্রু তৈরি করে থাকে তাহলে পরম করুণাময় আল্লা মানুষের জন্য কি কোন বিপদের কারণ তৈরি করে রেখেছে ? একটি হাদিস থেকে জেনে নেয়া যাক।

হাদিসগ্রন্থঃ মিশকাতুল মাসাবিহ, আধুনিক প্রকাশনি (২০১২)

১ম খন্ড, হাদিস নং – ৬১

৬১। হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার সাথে একটি জিন শয়তান ও একজন ফেরেশতা সাথী হিসাবে নিযুক্ত করে দেয়া হয়নি। সাহাবারা আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার

সাথেও? তিনি বললেন, আমার সাথেও। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাকে জিন শয়তানের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছেন। ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। সে আমার অনুগত হয়ে আমাকে কল্যাণের পরামর্শই দেয় (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের মর্মকথা হলো, প্রত্যেক ব্যক্তির সাথেই মোয়াক্কেল থাকে। এর থেকে একজন ফেরেশতা। এই ফেরেশতা মানুষকে কল্যাণের পথ বলে দেয়। বিভ্রান্তি ও ওয়াসওয়াসার পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। মানুষকে নেক কাজের নির্দেশনা দেয়। তার দিলে ভালো চিন্তার উদ্রেক করে।

আর একজন হলো শয়তান। শয়তান সব সময় মানুষকে ধোঁকা দিয়ে বিভ্রান্ত করে। খারাপ পথের নির্দেশনা দেয়। গুনাহ ও অকল্যাণের পথে ধাবিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্ট করে। এর থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

আমরা এই হাদিস থেকে জানলাম আল্লা প্রত্যেকটি মানুষের সাথেই একজন করে জিন শয়তান নিযুক্ত করে দেন যার কাজ মানুষকে খারাপ পথে নেয়া। যে আল্লা পরম করুণাময় সে আল্লা কেন মানুষের পিছে শয়তান লেলিয়ে দিবে ? সাধারণভাবেই এর উত্তর দেয়া হয় , আল্লা মানুষকে পরীক্ষা করছে ! উত্তরটা যৌক্তিক নয়। কারন, এই পরীক্ষা পদ্ধতিটা মানবীয় ব্যাপার , সবজান্তা ঈশ্বর ধারণার সাথে 'পরীক্ষা' পদ্ধতিটা মানানসই নয়। মানুষ মানুষের পরীক্ষা নেয় , কারণ একজন মানুষ অন্যজন সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে কিছু জানে না। কিন্তু আল্লা তো চূড়ান্ত জ্ঞানের অধিকারী। আল্লাই যে তাকদীরে চূড়ান্তভাবে সুপথ-বিপথ নির্ধারণ করে দেন, পরীক্ষার যে কোন অপেক্ষা রাখেন না তা সুরা আরাফের (৭:১৭৮) আয়াতের ব্যাখ্যা থেকে পরিষ্কার হয়।

১৭৮. আল্লাহ্ যাকে পথ দেখান সে-ই পথ পায় এবং যাদেরকে তিনি বিপথগামী করেন তারাই ক্ষতিগ্রস্ত(১)।

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

তাফসিরে যাকারিয়া , ১ম খন্ড , পৃষ্ঠা- ৮৫৯

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকে অন্ধকারে সৃষ্টি করেছেন। তারপর সেসবের উপর আপন নূরের জ্যোতি ফেললেন। যার উপর সে জ্যোতি পড়েছে সে হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে আর যার উপর সে জ্যোতি পড়েনি সে পথভ্রষ্ট হবে। এজন্য আমি বলি, আল্লাহ্র জ্ঞানের উপর লিখে কলম শুকিয়ে গেছে।' [তিরমিযীঃ ২৬৪২]

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা থেকে আমরা বিষয়টা বুঝতে পারলাম যে 'সুপথ' ও 'বিপথ' মানুষের কৃত কর্মের ফলে নির্ধারিত হয় না। পৃথিবীতে মানুষকে পাঠিয়ে পরীক্ষা নেবার কোন দরকারই নেই আল্লার। কেননা, আল্লা তার সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার পর যার

উপর তার নূরের জ্যোতি ফেলেছেন সে ই হেদায়েতপ্রাপ্ত বা সুপথ প্রাপ্ত , বাকিরা পথভ্রষ্ট বা বিপথগামী ! মানুষকে সৃষ্টি করার লগ্নেই নির্ধারিত হয়ে গেছে কে বিপথে যাবে , এটাই হল তাকদীর ! আরাফের ১৭৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তিরমিযী গ্রন্থের যে হাদিসটি উল্লেখ করা হল তার শেষ লাইনে দেখতে পাচ্ছি 'কলম শুকিয়ে গেছে' বলা, আরেকটি হাদিস থেকে এর অর্থ বুঝে নেয়া যাক ।

হাদিসগ্রন্থঃ মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস একাডেমি (২০১৩)

১ম খন্ড , পৃষ্ঠা – ৭৫ , হাদিস নং – ৮৮

৮৮ । আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি একজন যুবক মানুষ । তাই আমি আমার সম্পর্কে ব্যভিচারের জড়িয়ে পড়ার আশংকা করছি । অথচ কোন নারীকে বিবাহ করার (আর্থিক) সঙ্গতিও আমার নেই । আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যেন খাসী হবার অনুমতিই প্রার্থনা করছিলেন । আবূ হুরায়রাহ্ বলেন, এ কথা শুনে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যুত্তর না দিয়ে নীরব থাকলেন । আমি আবারও অনুরূপ প্রশ্ন করলাম । এবারও তিনি নীরব থাকলেন । সুতরাং আমি ঐরূপ প্রশ্ন করলাম, এবারও তিনি নীরব থাকলেন । আমি চতুর্থবার সেরূপ প্রশ্ন করলে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে আবূ হুরায়রাহ্! তোমার জন্য যা ঘটবার আছে তা আগে থেকেই তোমার ভাগ্যে নির্ধারিত হওয়ার মাধ্যমে ক্বলম শুকিয়ে গেছে । এখন তুমি এটা জেনে খাসীও হতে পার বা এমন ইচ্ছা পরিত্যাগও করতে পার ।[১০৭]

ব্যাখ্যা : جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ অর্থাৎ তোমার যা কিছু ঘটবে তা লিখে অবসর হওয়ার পর কলম শুকিয়ে গেছে । তুমি তোমার জীবনে যা কিছুর সম্মুখীন হবে তা তোমার জন্য নির্ধারিত । তোমার জন্য ফায়সালা করা রয়েছে । কোন কারণে তোমার নির্ধারিত বিষয়ে পরিবর্তন ঘটবে না । অতএব নির্ধারিত পরিবর্তন ঘটানোর উদ্দেশে কোন প্রকার হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া বৈধ নয় ।

فَاخْتَصِ عَلَى ذٰلِكَ أَوْ ذَرْ অর্থাৎ তুমি তা কর বা না কর তোমারে ব্যাপারে নির্ধারিত তাক্বদীর বাস্তবায়ন হবেই ।

উক্ত হাদিস থেকে জানতে পারলাম 'কলম শুকিয়ে যাওয়া'র অর্থ নির্ধারিত তাকদীরে পরিবর্তন না ঘটা । পূর্ব লিখিত ভাগ্য যদি অপরিবর্তনীয় হয় তাহলে মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে পরীক্ষা নেয়া অর্থহীন , অযৌক্তিক !

দোয়ার মাধ্যমে কি তাকদীর বা পূর্ব লিখিত ভাগ্য পরিবর্তন করা যায় ?

অনেকে একটি হাদিস দেখিয়ে বলে থাকেন যে দোয়ায় না কি তাকদীর পর্যন্ত বদলে যায়, আসুন সে সম্পর্কিত দুটি হাদিস ব্যাখ্যা সহ পড়ে দেখি প্রকৃতপক্ষে কি লেখা আছেঃ মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস একাডেমি (২০১৩), ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ২০৯-২১১

২২৩৩-[১১] সালমান আল ফারিসী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : দু'আ ছাড়া অন্য কিছুই তাক্বদীদের লিখনকে পরিবর্তন করতে পারে না এবং নেক 'আমাল ছাড়া অন্য কিছু বয়স বাড়াতে পারে না। (তিরমিযী)[২৭৮]

ব্যাখ্যা : মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, হাদীসের 'ক্বাযা' শব্দের অর্থ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে ফায়সালাকৃত বিষয়। আর হাদীসটির ব্যাখ্যা হলো যেই আল্লাহ তাক্বদীর নির্ধারণ করেছেন সেই আল্লাহই তার তাক্বদীরে লিখে রেখেছেন এখন সে দু'আ করবে আর দু'আর মাধ্যমে তার মুসীবাত দূর হয়ে যাবে।

মোট কথা হলো, তাক্বদীর দু'প্রকার :

১. المعلق বা যা পরিবর্তনশীল। ২. المبرم যা অপরিবর্তনশীল।

المعلق টি দু'আ বা সৎ 'আমালের মাধ্যমে পরিবর্তন হতে পারে। তবে المبرم টি কোন সময়ে পরিবর্তন হয় না। এমনটা মতামত 'উলামায়ে কিরামের।

আবু হুরাইরা বর্ণিত হাদিসটিতে তাকদীর অপরিবর্তনীয় কিন্তু সালমান ফারসী বর্ণিত হাদিসে তাকদীর পরিবর্তনীয় , স্পষ্টতই দুটি হাদিসের মধ্যে বৈপরিত্য দৃশ্যমান । ২২৩৩ নং হাদিসে 'ক্বাযা' শব্দটি রয়েছে যা দিয়ে বুঝায় 'ফয়সালাকৃত বিষয়' । কিন্তু এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছে 'আল্লাই তার তাকদীর লিখে রেখেছেন' এবং 'মুসিবত দূর হয়ে যাবে' কিন্তু এটা লিখেনি যে 'তাকদীর পরিবর্তন হয়ে যাবে' অথচ যা লিখা উচিত ছিল । এর পর আমরা দেখতে পাই তাকদীরের দুটি প্রকারভেদ । বোঝাই যাচ্ছে স্পষ্ট বৈপরিত্যকে লুকিয়ে একটা সমন্বয়ে আনার জোড়াতালি চেষ্টা। তবে ইসলামের মুরগী ইস্লামিস্টদেরই জবাই করতে দেয়া উচিত ! অর্থাৎ ইস্লামিস্টদের দৃষ্টি দিয়েই ইসলামকে বুঝে নিলাম ! উক্ত হাদিসে দোয়ার মাধ্যমে তাকদীর পরিবর্তন বলতে বিপদ-আপদ/ মুসিবত দূর হওয়াকে বুঝিয়েছে এবং দোয়া যে কেউ করবে সেটাও তাকদীরেই লেখা থাকে ! ঘুরেফিরে সেই তাকদীরেই যবনিকাপাত !!

২২৩৪-[১২] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : নিঃসন্দেহে দু'আ ঐ সব কিছুর জন্যই কল্যাণকামী যা সংঘটিত হয়েছে এবং যা এখনো সংঘটিত হয়নি। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা দু'আ করাকে নিজের প্রতি খুবই জরুরী মনে করবে বা যত্নবান হবে। (তিরমিযী)[২৭৯]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ) অর্থাৎ- যে কোন ধরনের বালা মুসীবাতে দু'আ করলে তা দূরীভূত হয়ে যায় সেটা যদি তাক্বদীরে মু'আল্লাক্বের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় হয়ে থাকে আর যদি তা তাক্বদীরে মুবরাম হয় তাহলে এ বিপদে ধৈর্যধারণ করার শক্তি আল্লাহ দিয়ে দেন, ফলে বিপদটি বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য সহ্য করা সহজ হয়ে যায়।

অর্থাৎ, তাকদীরে মুয়াল্লাক বা পরিবর্তনশীল তাকদীর হল 'বিপদ-আপদ-বালা মুসিবত'।

(فَعَلَيْكُمْ) অর্থাৎ- হে আল্লাহর বান্দাগণ! দু'আর অবস্থা যখন এরূপ যে, তা বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিপদ-আপদ দূর করতে সক্ষম তখন তোমরা সকলেই দু'আ কর। কেননা দু'আ তো 'ইবাদাতেরই একটি অংশ।

لن ينفع حذر من قدر ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم بالدعاء عباد الله.

অর্থাৎ- তাক্বদীর থেকে সতর্ক থাকা যায় না বা তা করে কোন উপকারও নেই তবে উপকার আছে আপতিত ও আগামীতে আপতিত আশংকাজনিত মুসীবাত থেকে বাঁচার দু'আ করার মধ্যে। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা বেশি বেশি দু'আ করো।

এবার আমরা সূরা আরাফের ১৭৮ নং আয়াতে বর্ণিত তাকদীর বিষয়ক তাফসীরে মাযহারির (৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৬৩৩-৩৪) ব্যাখ্যাটি দেখে নেইঃ

আরেকটি বিষয় এখানে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে যে, পথপ্রাপ্তি ও পথভ্রষ্টতা— দু'টোই নির্ধারিত হয় আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে।

একবার জাবিয়াহ্ নামক স্থানে হজরত ওমর ভাষণ দান করলেন। আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করার পর তিনি বললেন— মাইইয়াহ্ দিহিল্লাহু ফালা মুদ্বিল্লালাহু ওয়া মাইইউদ্বলিলহু ফালা হাদিইয়ালাহ্ (আল্লাহ্ যাকে পথ দেখান তাকে কেউ বিপথগামী করতে পারে না এবং যাকে তিনি বিপথগামী করেন তাকে পথ প্রদর্শনের অধিকার কেউ রাখে না)।

ওই সমাবেশে বসেছিলো জনৈক খৃষ্টান, ইহুদী অথবা অগ্নি উপাসক আলেম। সে হজরত ওমরের ভাষণ শুনে কিছু বললো। হজরত ওমর তাঁর অনুবাদককে বললেন, কী বলছে লোকটি? অনুবাদক বললো, সে বলছে, আল্লাহ্ কাউকে বিপথগামী করেন না। হজরত ওমর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, হে আল্লাহ্র দুশমন! তুমি মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্ই তো তোমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাকে বিপথগামী করে দিয়েছেন। ইনশাআল্লাহ্ আল্লাহ্ই তোমাকে প্রবেশ করাবেন দোজখে। তোমরা কর প্রদানের মাধ্যমে সন্ধিবদ্ধ হয়েছো আমাদের সঙ্গে। নতুবা এই মুহূর্তে আমি তোমার গর্দান উড়িয়ে দিতাম। এ কথা শুনে লোকটি সেখান থেকে উঠে চলে গেলো। তখন সমাবেশে তকদীর সম্পর্কে ভিন্নমতাবলম্বী আর কেউ রইলো না।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা থেকে আমরা জানলাম, কেউ যদি তাকদীর সম্পর্কে ভিন্নমত হয়ে বলে – ‘আল্লা কাউকে বিপথগামী করেন না’ – তাহলে হজরত ওমর তাকে আল্লার দুশমন ও মিথ্যাবাদী বলত এমনকি তার গর্দান উড়িয়ে দিতে চাইত ! আল্লার এমনই ফয়সালা বা তাকদীর সম্পর্কিত কোরানের আরেকটি আয়াত (১৮:১৭) ও তার ব্যাখ্যা (তাফসীরে মাযহারি, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ২৩২) জেনে নিইঃ

সূরা কাহফ, আয়াত ১৭

❑ দেখিলে দেখিতে— উহারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত, সূর্য উদয়কালে উহাদিগের গুহার দক্ষিণ পার্শ্বে হেলিয়া আছে এবং অস্তকালে উহাদিগকে অতিক্রম করিতেছে বাম পার্শ্ব দিয়া, এই সমস্ত আল্লাহের নিদর্শন। আল্লাহ্ যাহাকে সৎপথে পরিচালিত করেন সে সৎপথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনই তাহার কোন পথ-প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাইবে না।

শেষে বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ্ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন সে সৎপথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনোই তাঁর কোনো পথপ্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে না।’ একথার অর্থ— হে আমার রসুল! এই তত্ত্বটি আপনার জেনে নেয়া প্রয়োজন যে, পথ-প্রাপ্তি ও পথ-ভ্রষ্টতা সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র অভিপ্রায় নির্ভর। তিনি যাকে চান, তাকে করেন পথপ্রাপ্ত। আর পথভ্রষ্ট করতে চান যাকে, সে অবশ্যই হয় পথচ্যুত। আর যারা পথচ্যুত, তারা কখনো পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পায় না।

তাকদীর নিয়ে কোরানের আরেক জায়গায় (সূরা আলা,আয়াতঃ ৩) আল্লা যা বলছেন তা ব্যাখ্যাসহ (তাফসিরে যাকারিয়া, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৮১০-১১) দেখে নিই।

৩. আর যিনি নির্ধারণ করেন[৫] অতঃপর পথনির্দেশ করেন[৬],	وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى ۖ

(৫) অর্থাৎ প্রতিটি বস্তুকে তাকদীর নির্ধারণ করেছেন। প্রতিটি জিনিস সে তাকদীর অনুসরণ করছে। [সা'দী]

(৬) অর্থাৎ স্রষ্টা যে কাজের জন্যে যাকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে সে কাজের পথনির্দেশও দিয়েছেন। সত্যিকারভাবে এ পথনির্দেশে আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টিই অন্তর্ভুক্ত আছে। কেননা, এক বিশেষ ধরনের বুদ্ধি ও চেতনা আল্লাহ্ তা'আলা সবাইকে দিয়েছেন, যদিও তা মানুষের বুদ্ধি ও চেতনা থেকে নিম্নস্তরের। অন্য আয়াতে আছে: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ "তিনি বললেন, 'আমাদের প্রতিপালক তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুর জন্য তাকদীর নির্ধারণ করেছেন, তারপর পথনির্দেশ করেছেন।" [সূরা ত্বাহা: ৫০] এ হিসেবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করে এর জন্য তাকদীর নির্ধারণ করেছেন। তারপর সে তাকদীর নির্ধারিত বিষয়ের দিকে মানুষকে পরিচালিত করছেন। মুজাহিদ বলেন, মানুষকে সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্যের পথ দেখিয়েছেন। আর জীব-জন্তুকে তাদের চারণভূমির পথ দেখিয়েছেন। [ইবন কাসীর]

তাফসীরে যাকারিয়ার ২য় খন্ডের ১৬৫৩ নং পৃষ্ঠায় সূরা ত্বাহার ৫০ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছেঃ

কোন কোন মুফাসসির বলেন, আয়াতের অর্থ, আল্লাহ্র বাণী "আর যিনি নির্ধারণ করেন অতঃপর পথনির্দেশ করেন" [সূরা আল-আ'লা: ৩] এর মত, তখন এর দ্বারা অর্থ হবে, আল্লাহ্ প্রতিটি বস্তুর তাকদীর নির্ধারণ করেছেন, তারপর সেটাকে সে তাকদীরের দিকে চলার জন্য পথ দেখান। তিনি কার্যাবলী, আয়ু ও রিযিক লিখে নিয়েছেন। সে হিসেবে সমস্ত সৃষ্টিকুল চলছে। এর ব্যতিক্রম করার সুযোগ কারও নেই। এর থেকে বের হওয়াও কারও পক্ষে সম্ভব নয়। মূসা বললেন, আমাদের রব তো তিনিই, যিনি প্রতিটি সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন, তাকদীর নির্ধারণ করেছেন এবং সৃষ্টিকুলকে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে চালাচ্ছেন। [ইবন কাসীর]

সূরা আল আলা এবং সূরা ত্বাহার দুটি আয়াত থেকে আমরা দেখতে পেলাম আল্লা শুধু তাকদীর লিখেই ক্ষান্ত নয়, ঐ লিখিত তাকদীর আনুসারেই মানুষকে পরিচালিত

করছে। এই তাকদীরের ব্যতিক্রমও সম্ভব নয় এবং এই তাকদীর থেকে বের হওয়াও কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, সৃষ্টিকুলকে আল্লা ইচ্ছা অনুসারে চালাচ্ছেন !

এবার আমরা সূরা ইব্রাহিমের ৪ নং আয়াতটি ব্যাখ্যাসহ দেখে নিই-

সুরা ইব্‌রাহীম ঃ আয়াত ৪

وَمَآ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ رَّسُوۡلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمۡ ؕ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنۡ يَّشَآءُ وَ يَهۡدِىۡ مَنۡ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الۡحَكِيۡمُ ○

❒ আমি প্রত্যেক রসুলকেই তাহার স্বজাতির ভাষাভাষী করিয়া পাঠাইয়াছি তাহাদিগের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্য; আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যাটি তাফসিরে যাকারিয়ার ১ম খন্ড থেকে দেখে নিই –

অর্থাৎ আমি মানুষের সুবিধার জন্য নবীগণকে তাদের ভাষায় প্রেরণ করেছি- যাতে নবীগণ আমার বিধি-বিধান উত্তমরূপে বুঝিয়ে দেন। কিন্তু হেদায়াত ও পথভ্রষ্টতা এরপরও মানুষের সাধ্যাধীন নয়। আল্লাহ্ তা'আলাই স্বীয় শক্তিবলে যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্টতায় রাখেন এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দেন। সমগ্র জাতি যে ভাষা বোঝে নবী সে ভাষায় তার সমগ্র প্রচার কার্য পরিচালনা ও উপদেশ দান করা সত্ত্বেও সবাই হেদায়াত লাভ করে না। কারণ কোন বাণী কেবলমাত্র সহজবোধ্য হলেই যে, সকল শ্রোতা তা মেনে নেবে এমন কোন কথা নেই। সঠিক পথের সন্ধান লাভ ও পথভ্রষ্ট হওয়ার মূল সূত্র রয়েছে আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে চান নিজের বাণীর সাহায্যে সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং যার জন্য চান না সে হিদায়াত পায় না।

এবার উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যাটি তাফসিরে মাযহারির ৬ষ্ঠ খন্ড থেকে দেখে নিই –

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন' এ কথার অর্থ— ভ্রান্তি ও পথপ্রাপ্তি সম্পূর্ণতই আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায়-নির্ভর। অভিপ্রায় প্রয়োগের ব্যাপারে তিনি চিরমুক্ত, চির পবিত্র।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' এ কথার অর্থ— তিনি মহাপরাক্রান্ত। তাই তাঁর অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সুযোগ কারো নেই। আর তিনি মহাপ্রজ্ঞাধিকারী। কাউকে পথভ্রষ্ট করা এবং কাউকে পথ প্রদর্শন করার বিষয়টি তাঁর অপার প্রজ্ঞাময়তার একটি রহস্যময় নিদর্শন।

এবার আমরা দেখব তাকদীর সম্পর্কিত সূরা ইব্রাহিমের ২৭ নং আয়াতটি –

❒ যাহারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাহাদিগকে ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ্ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবেন এবং যাহারা সীমালংঘনকারী আল্লাহ্ উহাদিগকে বিভ্রান্তিতে রাখিবেন। আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহা করেন।

তাফসিরে যাকারিয়ার ১ম খন্ড থেকে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যাটি দেখে নিই –

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যা চান, তাই করেন। তিনি চাইলে কাউকে তাওফীক দেন, কাউকে তাওফীক থেকে বঞ্চিত করেন। কাউকে সুদৃঢ় রাখেন। কাউকে পদস্খলিত করেন। [বাগভী] কাউকে আযাব দেন, কাউকে পথভ্রষ্ট করেন। [কুরতুবী] তাঁর ইচ্ছাকে রুখে দাঁড়ায়, এমন কোন শক্তি নেই। উবাই ইবনে কা'ব, আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, হুযাইফা ইবন ইয়ামান প্রমুখ সাহাবী বলেনঃ মুমিনের এরূপ বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য যে, তার যা কিছু অর্জিত হয়েছে, তা আল্লাহ্র ইচ্ছায়ই অর্জিত হয়েছে। এটা অর্জিত না হওয়া অসম্ভব ছিল। এমনিভাবে যে বস্তু অর্জিত হয়নি, তা অর্জিত হওয়া সম্ভব ছিল না। তারা আরো বলেনঃ যদি তুমি এরূপ বিশ্বাস না রাখ, তবে তোমার আবাস হবে জাহান্নাম। কারণ, এটাই মূলতঃ তাকদীরের উপর ঈমান। আর যে কেউ তাকদীরের ভাল বা মন্দ হওয়ার উপর ঈমান আনবে না তার ঈমানই শুদ্ধ হবে না। তার আবাস জাহান্নাম হবেই। [ইবনুল কাইয়্যেম, তরীকুল হিজরাতাইন: ১/৮২]

তাফসিরে মাযহারির ৬ষষ্ঠ খন্ড থেকে উক্ত আয়াতটির ব্যাখ্যাটি দেখে নিই –

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তাই করেন।' একথার অর্থ, আল্লাহ্পাক কাউকে ইমান গ্রহণের সুযোগ দান করেন, কাউকে দান করেন না। কাউকে প্রতিষ্ঠিত রাখেন বিশ্বাসে, কাউকে রাখেন না। তাঁর এই চিরস্বাধীন অভিপ্রায়কে প্রশ্নবিদ্ধ করার অধিকার কারো নেই।

হজরত আবু দারদা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন, আল্লাহ্ প্রথম মানুষ আদমকে সৃষ্টি করার পর তাঁর দক্ষিণ স্কন্ধে হস্ত স্পর্শ করলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিপীলিকার আকারে পরিদৃশ্যমান হলো তাঁর পরবর্তী শুভ্রবর্ণ বংশধরগণ। এরপর আল্লাহ্ তাঁর হাত রাখলেন আদমের বাম কাঁধে। বেরিয়ে এলো তাঁর কৃষ্ণবর্ণ বংশধরেরা। তারা অবস্থান গ্রহণ করলো বাম পাশে। ডান পাশের দলকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ বললেন, এরা জান্নাতি। আর বাম পাশের দলকে লক্ষ্য করে বললেন, এরা জাহান্নামী। আর এদের সম্পর্কে আমি উদ্বিগ্ন নই।

হজরত উবাই বিন কা'ব থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে পৃথিবীবাসী ও আকাশবাসী সকলকেই শাস্তি দিতে পারেন। এরকম করলে তাঁকে অত্যাচারী বলা যাবে না। আবার ইচ্ছে করলে সকলকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন। আর এমতাবস্থায় তাদের কৃতকর্মাপেক্ষা তাঁর অনুকম্পাই হবে প্রধান। মনে রেখো তকদীরে যার বিশ্বাস নেই, তার উহুদ পাহাড়ের সমান স্বর্ণরৌপ্য দানও আল্লাহ্ গ্রহণ করেন না। আরো মনে রেখো, তাঁর নিকট থেকে তোমাদের উপরে যা আপতিত হয়, তা প্রতিহত করার সাধ্য কারো নেই। আর যা তিনি প্রেরণ করবেন না, তা আনয়নের সামর্থ্যও কারো নেই। এই বিধানের বিপরীত বিশ্বাস নিয়ে যদি কেউ মৃত্যুবরণ করে, তবে সে অবশ্যই হবে জাহান্নামী। আহমদ, ইবনে মাজা। হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত হুযায়ফা ও হজরত জায়েদ বিন সাবেত থেকেও অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

উক্ত ব্যাখ্যা থেকে আমরা জানলাম আল্লা কাউকে কাউকে ঈমান গ্রহনের সুযোগ দেন না , কাজেই তারা ঈমান হারা হতে বাধ্য, মানুষ যেন নিষ্ক্রয় পুতুল ! আবু দারদা

বর্নিত হাদিস থেকে জানলাম আল্লা প্রথম মানুষ আদমের বাম কাধ স্পর্শ করে একদল কালোবর্ণের মানুষ বের করলেন যারা জাহান্নামী অর্থাৎ জাহান্নামের জন্যই আল্লা তাদের বানিয়েছে ! মনে প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে মানুষের কৃতকর্ম , ইবাদত বা আমলের কি মূল্য রইল ? এই প্রশ্নের উত্তর হাদিস থেকে জেনে নেয়া যাক –

হাদিসগ্রন্থঃ মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস একাডেমি (২০১৩), ১ম খন্ড, হাদিস – ৯৫

৯৫। মুসলিম ইবনু ইয়াসার (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে কুরআনের এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল : "(হে মুহাম্মাদ!) আপনার রব যখন আদাম সন্তানদের পিঠ থেকে তাদের সব সন্তানদেরকে বের করলেন" (সূরাহ্ আল আ'রাফ৭ : ১৭২) (...আয়াতের শেষ পর্যন্ত)। 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি শুনেছি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয় এবং তিনি জবাবে বলেন, আল্লাহ তা'আলা আদাম আলায়হিস্ সালাম-কে সৃষ্টি করলেন। অতঃপর আপন ডান হাত তাঁর পিঠ বুলালেন। আর সেখান থেকে তাঁর (ভবিষ্যতের) একদল সন্তান বের করলেন। অতঃপর বললেন, এসবকে আমি জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি, তারা জান্নাতীদের কাজই করবে। আবার আদামের পিঠে হাত বুলালেন এবং সেখান থেকে (অপর) একদল সন্তান বের করলেন এবং বললেন, এদেরকে আমি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং তারা জাহান্নামীদেরই 'আমাল করবে। একজন সহাবী জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! তাহলে 'আমালের আর আবশ্যকতা কি? উত্তরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন আল্লাহ কোন বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তার দ্বারা জান্নাতীদের কাজই করিয়ে নেন। শেষ পর্যন্ত সে জান্নাতীদের কাজ করেই মৃত্যুবরণ করে এবং আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। এভাবে আল্লাহ তাঁর কোন বান্দাকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন, তার দ্বারা জাহান্নামীদের কাজই করিয়ে নেন। পরিশেষে সে জাহান্নামীদের কাজ করেই মৃত্যুবরণ করে, আর এ কারণে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দাখিল করেন।[১১৪]

ব্যাখ্যা : উল্লিখিত হাদীসখানা আবূ দাউদ এবং তিরমিযী থেকে সংকলিত, যেখানে সুস্পষ্ট যে, শুধু 'আমালের দ্বারা জান্নাত বা জাহান্নামে কেউ যাবে না বরং আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত বিষয় 'তাক্বদীর' এখানে বিশেষভাবে কার্যকর। অতএব, যার তাক্বদীরে যা লিখা আছে সে তারই হকদার হবে।

সূরা হাদিদের ২১ নং আয়াত অনুযায়ী বান্দার কৃতকর্ম বা আমল অকেজো বিষয়ঃ-

২১. তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের রবের ক্ষমা ও সে জান্নাত লাভের প্রয়াসে, যা প্রশস্ততায় আসমান ও যমীনের প্রশস্ততার মত[১], যা প্রস্তুত করা হয়েছে তাদের জন্য যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনে। এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছে তিনি এটা দান করেন[২]; আর আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল।

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿۲۱﴾

ব্যাখ্যায় - তাফসীরে যাকারিয়া, পৃষ্ঠাঃ ২৫৮১

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপার বদৌলতেই মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমাদের আমল তোমাদের কাউকে মুক্তি দিতে পারে না। সাহাবায়ে-কেরাম আরয করলেনঃ আপনিও কি তদ্রূপ? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, আমিও আমার আমল দ্বারা জান্নাত লাভ করতে পারি না—আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুকম্পা হলেই লাভ করতে পারি। [বুখারী: ৫৬৭৩, মুসলিম:

তাফসীরে মাযহারী, ১১ তম খন্ডে এর ব্যাখ্যাঃ

তাফসীরে মাযহারী/৩২৬

আল্লাহ্র অনুগ্রহনির্ভর। তিনি যাকে ইচ্ছা করবেন, তাকেই জান্নাত দান করবেন। তিনি যে বড়ই অনুগ্রহপরবশ। তাই ইমান যারা আনবে তাদেরকে তিনি দয়া করে জান্নাত প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন। অঙ্গীকারও তাঁর অনুগ্রহ। নতুবা তিনি তো কারো ইচ্ছামতো পরিচালিত হতে কখনোই বাধ্য নন। বাধ্যতা, অত্যাবশ্যকতা ও ঔচিত্য থেকে তিনি সততমুক্ত, চিরপবিত্র। পথভ্রষ্ট মুতাজিলারা বলে, ইমানদারদেরকে বেহেশত প্রদান করা আল্লাহ্র জন্য অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ তাদেরকে জান্নাত দিতে তিনি বাধ্য (আল্লাহ্ রক্ষা করুন)।

একটি প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন 'উদখুলূল জ্বান্নাতা বিমা কুনতুম তা'মালূন' (তোমাদের আমলের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করো)। সুতরাং আমল মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে না কেনো?

উত্তর ঃ জান্নাতে রয়েছে বহুবিধ মর্যাদা ও স্তর। ওই মর্যাদা ও স্তরসমূহ নির্ধারণ করা হবে আমলের তারতম্যানুসারে। কিন্তু জান্নাতে প্রবেশ ও সেখানে চিরকাল বসবাস নির্ধারিত হবে কেবল আল্লাহ্র অনুগ্রহের কারণে। একথার সমর্থন রয়েছে হান্নাদের 'আজজুহুদ' গ্রন্থে হজরত ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসে, যেখানে তিনি বলেছেন, তোমরা পুলসিরাত অতিক্রম করবে আল্লাহ্র ক্ষমায়, জান্নাতে প্রবেশ করবে আল্লাহ্র অনুগ্রহে এবং জান্নাতে মর্যাদালাভ করবে কৃতকর্ম অনুসারে। আউন ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে আবু নাঈমও এরকম বর্ণনা করেছেন।

মিশকাতুল মাসাবি, হাদিস একাদেমি, তাকদীর সম্পর্কে ৮২, ৮৫ নং হাদিসগুলো দেখা যাক –

৮২। ইবনু মাস্‌'উদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে স্বীকৃত আল্লাহর রসূল বলেছেন : তোমাদের প্রত্যেকেরই জন্ম হয় এভাবে যে, তার মায়ের পেটে (প্রথমে তার মূল উপাদান) শুক্ররূপে চল্লিশ দিন পর্যন্ত থাকে। অতঃপর তা চল্লিশ দিন পর্যন্ত লাল জমাট রক্তপিণ্ডরূপ ধারণ করে। তারপর পরবর্তী চল্লিশ দিনে মাংসপিণ্ডের রূপ ধারণ করে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা একজন মালাককে চারটি বিষয় লিখে দেয়ার জন্য পাঠন। সে মালাক লিখেন তার– (১) 'আমাল [সে কি কি 'আমাল করবে], (২) তার মৃত্যু, (৩) তার রিয্‌ক ও (৪) তার নেককার বা দুর্ভাগা হওয়ার বিষয় আল্লাহ্‌র হুকুমে তার তাক্বদীরে লিখে দেন, তারপর তন্মধ্যে রূহ্‌ প্রবেশ করান। অতঃপর সে সত্তার কসম, যিনি ব্যতীত প্রকৃত আর কোন ইলাহ নেই! তোমাদের মধ্যে কেউ জান্নাতবাসীদের 'আমাল করতে থাকে, এমনকি তার ও জান্নাতের মধ্যে মাত্র এক হাত দূরত্ব থাকে, এমন সময় তার প্রতি তাক্বদীরের লিখা তার সামনে আসে। আর তখন সে জাহান্নামীদের কাজ করতে থাকে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করে। তোমাদের কোন ব্যক্তি জাহান্নামীদের মত 'আমাল করতে শুরু করে, এমনকি তার ও জাহান্নামের মধ্যে এক হাত দূরত্ব অবশিষ্ট থাকে। এমন সময় তার প্রতি সে লেখা (তাক্বদীর) সামনে আসে, তখন সে জান্নাতীদের কাজ করতে শুরু করে, ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে।[১০০]

৮৫। 'আলী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার অবস্থান জান্নাতে কিংবা জাহান্নামে লিখে রাখেননি। সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে এ াহ্‌র রসূল! তাহলে আমরা কি আমাদের তাক্বদীরের লেখার উপর নির্ভর করে আ'মাল ছেড়ে দিব না? নার্বি। বললেন, (না, বরং) আ'মাল করে যেতে থাক। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে কাজ

তার জন্য সহজ করে দেয়া হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান তাকে আল্লাহ সৌভাগ্যের কাজ করার জন্য সহজ ব্যবস্থা করে দিবেন। আর সে ব্যক্তি দুর্ভাগা হবে যার জন্য দুর্ভাগ্যের কাজ সহজ করে দেয়া হবে। অতঃপর রসূল (কুরআনের এ আয়াতটি) পাঠ করলেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে (সময় ও অর্থ) ব্যয় করেছে, আল্লাহকে ভয় করেছে, হাক্ব কথাকে (দীনকে) সমর্থন জানিয়েছে"– সূরাহ্‌ আল্‌ লায়ল ৫-৬ নং আয়াতের শেষ পর্যন্ত।[১০৩]

ব্যাখ্যা : أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا এই বাক্য দ্বারা বুঝা যায় যে, আমাদের জন্য তাক্বদীরে যা নির্ধারিত রয়েছে তার উপরই নির্ভর করব কি-না, এবং আ'মাল বর্জন করব কি-না অর্থাৎ আ'মালের প্রচেষ্টা ত্যাগ করব কি-না। কারণ, যখন আমাদের জান্নাতী বা জাহান্নামী হওয়াটা পূর্ব নির্ধারিত তখন 'আমালের প্রতিযোগিতা করেই বা কি লাভ? কেননা আল্লাহর ফায়সালা তো কখনও পরিবর্তিত হওয়ার নয় এবং তার নির্ধারিত বিষয় কখনও রদ হওয়ার নয়।

জেনে রাখা উচিত যে, যাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য জান্নাতের 'আমালটাই অধিক সহজ হবে। আর এই সহজতাই তার জান্নাতী হওয়ার আলামত। পক্ষান্তরে যার জন্য জান্নাতী 'আমালটা সহজ নয়। সে জান্নাতী নয় বরং জাহান্নামের অধিবাসী।

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সকল কর্ম পরিচালনা করেন এবং তা একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্তও করে।

যার জন্য জান্নাত নির্ধারিত তার জন্য জান্নাতী 'আমালটাও তো নির্ধারিত এবং সেই কৃতকর্মই তাঁর জন্য উপযোগী হবে এবং সে কর্মের উপরই তাকে উৎসাহ এবং ধমকের মাধ্যমে উজ্জীবিত করা হয়। আর যার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করা হয়েছে তাঁর জন্য মন্দটাই নির্ধারিত। এমনকি সে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং তার মাওলার আদেশ বর্জন করে।

ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী কেউ যদি যেনা বা ধর্ষণ করে সেটা তার তাকদীর অনুসারেই করে এবং কতটুকু যেনা করবে তার পরিমাণও নির্ধারণ করে রেখেছে মহান আল্লাপাক। একই গ্রন্থের ৮৬ নং হাদিস থেকে আমরা এটা জেনে নিই –

৮৬। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : মহান আল্লাহ তা'আলা আদাম সন্তানের জন্য তার ব্যভিচারের অংশ লিখে রেখেছেন, সে তা নিশ্চয়ই করবে। চোখের ব্যভিচার হল দেখা, জিহ্বার ব্যভিচার কথা বলা (যৌন উদ্দীপ্ত কথা বলা)। আর মন চায় ও আকাঙ্ক্ষা করে এবং গুপ্তাঙ্গ তাকে সত্য বা মিথ্যায় প্রতিপন্ন করে।[১০৪]

কিন্তু সহীহ মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে, আদাম সন্তানের জন্য তাক্বদীরে যিনার অংশ যতটুকু নির্ধারণ করা হয়েছে, সে ততটুকু অবশ্যই পাবে। দুই চোখের যিনা তাকানো, কানের যিনা যৌন উদ্দীপ্ত কথা শোনা, মুখের যিনা আবেগ উদ্দীপ্ত কথা বলা, হাতের যিনা (বেগানা নারীকে খারাপ উদ্দেশে) স্পর্শ করা আর পায়ের যিনা ব্যভিচারের উদ্দেশে অগ্রসর হওয়া এবং মনের যিনা হল চাওয়া ও প্রত্যাশা করা। আর গুপ্তাঙ্গ তা সত্য বা মিথ্যায় প্রতিপন্ন করে।[১০৫]

তাকদীরে লেখা থাকার কারণে যে শুধু মানুষই এমন যেনা ব্যভিচারের মত নাফরমানি করবে তা ই শুধু নয়, ইসলামি বিশ্বাস মতে সৃষ্টির প্রথম মানব আদমও তার তাকদীর অনুসারেই আল্লার আদেশ অমান্য করে নাফরমানি করায় আদমকে বেহেস্ত থেকে দুনিয়াতে নামিয়ে দেন। আল্লা যা আদমের জন্য নির্ধারণ করেছিল, আদম তাই করেছিল আর তা করার জন্যই সে আল্লার অবাধ্য বলে পরিগণিত হয়েছিল, এটাই ন্যায়বিচারক আল্লার ন্যায় বা জাস্টিস! তাকদীর সম্পর্কিত আদমের এই হাদিসটিও পড়ে নেয়া যাক –

হাদিসগ্রন্থঃ মিশকাতুল মাসাবিহ, আধুনিক প্রকানি(২০১২), ১ম খন্ড, হাদিস-৭৫

৭৫। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (আলমে আরওয়াহে) হযরত আদম ও হযরত মূসা (আ) পরস্পর তাঁদের রবের সামনে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হলেন। এ তর্কে হযরত আদম (আ) মূসার উপর বিজয়ী হলেন। হযরত মূসা বললেন, আপনি ওই আদম, যাঁকে আল্লাহ তাঁর নিজ হাতে তৈরী করেছেন। আপনার মধ্যে তাঁর রূহ ফুঁকেছেন। ফেরেশতাদের দ্বারা আপনাকে সিজদা করিয়েছেন। আপনাকে জান্নাতে স্থান দিয়েছিলেন। এরপর আপনার ভুলের কারণে আপনি মানবজাতিকে যমীনে নামিয়ে দিয়েছেন (অর্থাৎ আপনি যদি এ ভুল না করতেন তাহলে আপনাকে যমীনে নামিয়ে দেয়া হতো না। আর আপনার আওলাদদেরকেও এখানে আসতে হতো না, বরং তারা জান্নাতে থাকতো)। আদম (আ) জবাবে বললেন, তুমি ওই মূসা যাঁকে আল্লাহ তায়ালা নবুয়াতের পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন, আল্লাহর সাথে পরস্পর কথা বলার মর্যাদায়ও অভিষিক্ত করেছেন। তোমাকে তাওরাত দান করেছেন, যাতে সব কিছু লিখা ছিলো। এরপর তোমার সাথে গোপন কথা বলার জন্য নৈকট্য দান করেছেন। তুমি কি জানো আল্লাহ আমার সৃষ্টির কত বছর আগে তাওরাত লিখে রেখেছিলেন? মূসা (আ) বললেন, চল্লিশ বছর আগে। আদম (আ) বললেন, তুমি কি তাওরাতে এ শব্দগুলো লিখিত পাওনি যে, আদম তাঁর রবের নাফরমানী করেছে এবং পথভ্রান্ত হয়েছে? মূসা (আ) জবাব দিলেন, হাঁ, পেয়েছি। আদম (আ) বললেন, তারপর তুমি আমাকে আমার আমলের জন্য দোষারোপ করছো কেনো, যা আমার সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বে আল্লাহ আমার জন্য লিখে রেখেছিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই দলিল দ্বারা আদম (আ) মূসার উপর জয়ী হলেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আদম (আ) হযরত মূসার নিকট যে দলীল পেশ করেছেন তার অর্থ এই ছিল না যে, আল্লাহ আমার সৃষ্টিরও চল্লিশ বছর আগে লিখে দিয়েছিলেন, আমি শয়তানের প্ররোচনার কারণে পথভ্রষ্ট হয়ে খোদার হুকুমের নাফরমানী করে নিষিদ্ধ গাছের ফল ভোগ করবো। তাই এতে আমার নিজের এখতিয়ার নেই। বরং

এর অর্থ হলো, এটা আমার তকদীরে লিখা ছিলো। তাই এই কাজ আমার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। এটা হবার ছিলো। কাজেই আমি এভাবে অভিযোগের টার্গেট হতে পারি না। আল্লামা তুরপুশতী বলেছেন, এর অর্থ হলো, যেহেতু আল্লাহ এই গোমরাহী আমার ভাগ্যে আমার সৃষ্টিরও চল্লিশ বছর পূর্বে লাওহে মাহফুজে লিখে রেখেছিলেন। তাই এটা সময় মতো ঘটবে। যখন সময় এসে পৌঁছেছে তখন এটা না ঘটা কিভাবে সম্ভব ছিলো? তুমি তো আমার বাহ্যিক আমলের কথা জানো, তাই আমার উপরে এই অভিযোগ আনছো। কিন্তু আসল ব্যাপার আমার তাকদীরের লিখার কথা তুমি এড়িয়ে গেছো।

এই হাদিস থেকে জানতে পারলাম আল্লাই আদমের গোমরাহীর কথা তার সৃষ্টির ৪০ বছর আগে তার তাকদীরে লিখে দিয়েছিল বলেই তা সময় মত ঘটেছিল। আদমের তাকদীরে যদি লেখা থাকে শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিবে, তাহলে শয়তানের তাকদীরেও এটা লেখা ছিল যে শয়তান আদমকে কুমন্ত্রণা দিতে যাবে! কারণ, আদম ও শয়তান মিলেই কুমন্ত্রণার ঘটনাটি ঘটিয়েছিল। এখানে কোরানের সূরা মুজাদালার ১০ নং আয়াতটি দেখে নেয়া যাক –

১০. গোপন পরামর্শ তো কেবল শয়তানের প্ররোচনায় হয় মুমিনদেরকে দুঃখ দেয়ার জন্য। তবে আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া শয়তান তাদের সামান্যতম ক্ষতি সাধনেও সক্ষম নয়। অতএব আল্লাহ্‌র উপরই মুমিনরা যেন নির্ভর করে।

إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ⑩

উক্ত আয়াতটি বিবেচনায় নিলে বুঝা যায় , শয়তান আল্লার অনুমতিতেই মানুষের ক্ষতিসাধন করে থাকে।

আদমের গোমরাহীর সহায়ক হয়েছিল যে শয়তান, সেই শয়তানও তাকদীর উল্লেখ করে অভিযোগ করেছিল যে আল্লাই তার সর্বনাশ করেছে মানে শয়তানকে শয়তান বানিয়েছে। কিন্তু, আদম যেমন তাকদীরের কথা বলে পাড় পেয়ে গেছে , শয়তান তেমনটি পায়নি।

সূরা হিজরের ৩৯ নং আয়াত উল্লেখ করে ' শারহুল আক্বীদা আত ত্বহাবিয়্যাহ' গ্রন্থের ১ম খন্ডের ২০১ নাম্বার পৃষ্ঠায় বলা হচ্ছেঃ

আর ইবলীসের কথা,

﴿رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾

"হে আমার রব! তুমি যেমন আমাকে বিপথগামী করলে ঠিক তেমনিভাবে আমি পৃথিবীতে এদের জন্য প্রলোভন সৃষ্টি করে এদের সবাইকে বিপথগামী করবো",
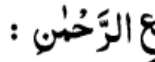
এখানে ইবলীস তাক্বদীর দ্বারা যে দলীল পেশ করেছে, তার কারণে তাকে দোষারোপ করা হয়েছে। কিন্তু এ জন্য দোষারোপ করা হয়নি যে, সে তাক্বদীরকে স্বীকার করে নিয়েছিল

অর্থাৎ, তাকদীরের কথা বলায় শয়তানকেই দোষারোপ করা হচ্ছে, যেই তাকদীর লিখেছিল আল্লা ই। শয়তান তাকদীর স্বীকার করুক আর না করুক, ইসলামের বিশ্বাস

অনুযায়ী তো তাকদীরের বাইরে যাওয়ার সাধ্য তার নেই, কারোরই নেই! যা আমরা পুর্বের হাদিসগুলোতে পড়েছি। শয়তানের কথা যৌক্তিক, কেননা, আল্লা যেহেতু সব কিছুর তাকদীর লিখে দিয়েছে এমন কি কখন একটা পাতা শুকিয়ে যাবে সেই সময়টিও লিখে রেখেছে তাহলে আল্লার নির্দেশ অমান্য করে আদমকে সিজদা না করার মত এত বড় ঔদ্ধত্যপূর্ণ ঘটনা নিশ্চয়ই শয়তানের তাকদীরে লেখা থাকারই কথা। আল্লা যখন কোন কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তখন বলেন 'হও' আর হয়ে যায়। (৩৬:৮২)। অথচ, ইবলিশকে নির্দেশ দেয়ার পরও ইবলিশ আদমকে সিজদা করেনি। বিষয়টা বড়ই গোলমেলে। এই সমস্যার একটাই সমাধান তা হল ইবলিশও তার তাকদীর অনুসারেই আল্লাকে অমান্য করেছে। তাকদীর অনুসারেই যদি ইবলিশ এ কাজ করে থাকে তাহলে আদমকে সেজদা করতে বলার এই নাটকটাই অযৌক্তিক হয়ে যায়। আর আযাযিল জিনকে ইবলিশ শয়তানে রুপান্তরও অন্যায্য হয়ে যায়। ফলে, স্রষ্টার 'ন্যায়পরায়ণ' গুণটাও ক্ষুণ্ন হয়! আবার, ইবলিশ যদি আল্লার ইচ্ছার বাইরে গিয়ে আল্লার নির্দেশকে অমান্য করতে পারে তাহলে আল্লার 'সর্বশক্তিমান' গুণটাও ক্ষুন্ন হয়, যা স্রষ্টা হিসেবে আল্লার জন্য অপমানজনক! ইবলিশের পূর্বে তো কোন ইবলিশ ছিল না, তাহলে কার প্ররোচনায় সে আল্লার নির্দেশ অমান্য করল? এমন প্রশ্নে বলা হয় 'নফস' এর প্ররোচনায় ইবলিশ ওমন করেছিল। কিন্তু, একটা

সহিহ হাদিস দেখলে বুঝা যায় এই নফসের অযুহাতটাও অযৌক্তিক। নফস বলতে বোঝায় মন, অহংবোধ, আত্মা বা প্রবৃত্তিকে। তাহলে হাদিসটা দেখা যাক –

হাদিসগ্রন্থঃ মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস একাডেমি (২০১৩), ১ম খন্ড, হাদিস-৮৯

৮৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : সমস্ত অন্তর আল্লাহর আঙ্গুলসমূহের দুই আঙ্গুলের মধ্যে একটি অন্তরের ন্যায় অবস্থিত। তিনি নিজের আঙ্গুলগুলোর দ্বারা তা যেভাবে ইচ্ছা ঘুরিয়ে থাকেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী আল্লাহ! আমাদের অন্তরকে তোমার 'ইবাদাত ও আনুগত্যের দিকে ঘুরিয়ে দাও।"[১০৮]

ব্যাখ্যা : بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ এটি আল্লাহর সিফাত অর্থাৎ গুণবাচক হাদীস। এতে যা বর্ণিত হয়েছে কোন প্রকার ব্যাখ্যা ছাড়াই আমরা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব। এর অর্থ জানার চেষ্টা করব না। এ বিষয়ে ঈমান আনা ওয়াজিব এবং তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকাও ওয়াজিব। যে তা মেনে নিবে সেই সঠিক পথপ্রাপ্ত। যে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে প্রবেশ করবে সে পথভ্রষ্ট।

হাদীসের অর্থ, বান্দার অন্তর পরিবর্তন করা আল্লাহর নিকট অতি সহজ। তিনি তাঁর বান্দাদের অন্তর বা যে কোন বিষয়ে তাঁর ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। এ কাজে তাঁর কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। আর তিনি যা করতে চান তা তাঁর হাত ছাড়া হয় না।

উক্ত হাদিস থেকে আমরা জানতে পারলাম, নফসের দোহায় দিয়েও পাড় পাওয়া যাবে না। কারণ নফস, অন্তর, মন এসবই আল্লাই নিয়ন্ত্রণ করে তার কুদরতি আঙ্গুল দ্বারা। আল্লা যদি আমাদের অন্তরকেই নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে কি কারো স্বাধীন ইচ্ছা বা ফ্রি উইল বলে কিছু থাকে? কেউ কিছু করার আগে তা করার ইচ্ছা করে, তারপর কাজে লিপ্ত হয়। কিন্তু, সেই ইচ্ছেটাই যদি কেউ নিজেরা না করতে পারে সেই কাজের দায় কি তাদের হবে? এই ইচ্ছে করা নিয়ে কোরানের বক্তব্য দেখা যাক –

সূরা দাহর, আয়াত ৩০

৩০. তোমরা ইচ্ছা করিবে না যদি না আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা - তাফসীরে ইবিনে কাছির , ১১ তম খন্ড , পৃঃ ৩৭২

وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা না হওয়া পর্যন্ত কাহারো ইচ্ছা পূরণ হইবার নহে। আল্লাহ্‌র মঞ্জুরি ব্যতীত কেহ নিজেকে হিদায়াত করিতে, ঈমান আনয়ন করিতে এবং নিজের কোন উপকার করিতে সক্ষম নহে।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা – তাফসীরে মাযহারি, ১২ তম খন্ড , পৃঃ ২৮৮

একথার অর্থ— হে মানবমণ্ডলী! অথবা হে মক্কার পৌত্তলকেরা! জেনে রাখো, তোমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা কখনোই বাস্তবরূপ লাভ করবে না, যতোক্ষণ না তা সমর্থনপুষ্ট হয় আল্লাহ্‌র ইচ্ছার। সুতরাং আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়কে মান্য না করে শুভউপদেশাবলীর অনুসরণ অথবা অননুসরণ অসম্ভব।

সূরা তাকভীর , আয়াত ২৯ (একই আয়াত সূরা দাহর , আয়াত ৩০)

২৯. তোমরা ইচ্ছা করিবে না, যদি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্ ইচ্ছা না করেন।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা – তাফসীরে যাকারিয়া, ২য় খন্ড , পৃঃ ২৭৮১

অর্থাৎ তোমরা সরল পথে চলতে চাইলে এবং আল্লাহ্‌র দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে চাইলেই থাকতে পারবে না যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা না করবেন। সুতরাং তাঁর কাছেই তাওফীক কামনা করো। তবে এটা সত্য যে, কেউ যদি আল্লাহ্‌র পথে চলতে ইচ্ছে করে তবে আল্লাহ্‌ও তাকে সেদিকে চলতে সহযোগিতা করেন। মূলত আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হওয়ার পরই বান্দার সে পথে চলার তাওফীক হয়। বান্দার ইচ্ছা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুসারেই হয়। তবে যদি ভাল কাজ হয় তাতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি থাকে, এটাকে বলা হয় 'আল্লাহ্‌র শরীয়তগত ইচ্ছা'। পক্ষান্তরে খারাপ কাজ হলে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সংঘটিত হলেও তাতে তাঁর সন্তুষ্টি থাকে না। এটাকে বলা হয় 'আল্লাহ্‌র প্রাকৃতিক ইচ্ছা'। এ দু' ধরনের ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্য না করার কারণে অতীতে ও বর্তমানে অনেক দল ও ফের্‌কার উদ্ভব ঘটেছে। [দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-ইস্তেকামাহঃ ১/৪৩৩; মিনহাজুস সুন্নাহঃ ৩/১৬৪]

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা – তাফসিরে মাযহারি , ১২ তম খন্ড , পৃঃ ৩৭৫

হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে আবী হাতেম, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার সূত্রে ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম এবং সুলায়মান ইবনে কাসেম, ইবনে মুখাইমিয়া সূত্রে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো, তখন আবু জেহেল বললো, বাহ্! এবার তো পরিষ্কার করে বলেই দেওয়া হলো যে, যে সরল পথে চলতে চায়, তার জন্যই কোরআন উপদেশ। অর্থাৎ যে এরকম চায় না, তার কাছে কোরআন কিছুই নয়। এভাবে তো বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে করে দেওয়া হলো আমাদের ইচ্ছাধীন। অর্থাৎ হে মোহাম্মদ! আমরা ইচ্ছা করলে তোমার পথে চলতে পারি, আবার না-ও পারি। তার এমতো কুটকথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত (২৯)। বলা হলো—

'তোমরা ইচ্ছা করবে না, যদি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্ ইচ্ছা না করেন'। একথার অর্থ— হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীর দল! তোমরা ভেবেছো কী? ইচ্ছা করলেও তো তোমরা সরল পথের পথিক হতে পারবে না, যতোক্ষণ না তোমরা লাভ করবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার আনুকূল্য, অনুমোদন অথবা সমর্থন। কেননা তিনিই সর্বাধিপতি।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা তাফসীরে ইবনে কাছির , ১১ তম খন্ড , পৃঃ ৪৩২

وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ মানুষ যাহা চাহে তাহাই বাস্তবায়িত হয় না। বরং মানুষের ইচ্ছার বাস্তবায়ন আল্লাহ্‌র মঞ্জুরির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং কেহ চাহিলেই হিদায়াত লাভ করিতে পারে না আবার ইচ্ছা করিলেই পথভ্রষ্ট হইতে পারে না– বরং আল্লাহ্ যাহাকে হিদায়াত দান করেন সেই হিদায়াত পায় আর যাহাকে বিভ্রান্ত করেন সেই বিভ্রান্ত হয়।

সূরা মুদদাছছির , আয়াত – ৫৬ , ব্যাখ্যায় – তাফসীরে মাযহারি, ১২ তম খন্ড , পৃঃ- ২৩৬

শেষোক্ত আয়াতে (৫৬) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ উপদেশ গ্রহণ করবে না, একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করবার অধিকারী'। একথার অর্থ— কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, আল্লাহ পাকের অভিপ্রায়ের আনুকূল্য না পেলে কোরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ করে উপকৃত হওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। সুতরাং ভয় যদি করতে হয়, তবে ভয় করতে হবে তাঁকেই। ক্ষমাপ্রার্থীও হতে হবে কেবল তাঁরই সকাশে। কেননা ক্ষমা করার অধিকার ও যোগ্যতাও সংরক্ষণ করেন কেবল তিনিই। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাটিও সুপ্রমাণিত হয় যে, মানুষের সকল প্রকার কর্মকাণ্ডই আল্লাহ্‌র সতত স্বাধীন অভিপ্রায়ের সঙ্গে বিজড়িত।

হাদিস ও কোরানের আলোকে আমরা জানতে পারলাম যে –

১. আল্লা অন্তরসমূহ যেভাবে ইচ্ছা ঘুরিয়ে দেন অর্থাৎ অন্তর পরিবর্তনকারী।

২. আল্লার ইচ্ছা না হওয়া পর্যন্ত কারো ইচ্ছা পূরণ হবার নয়।

৩. শুধুমাত্র মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছাতেই কিছু বাস্তবরুপ লাভ করে না।

৪. বান্দার ইচ্ছা আল্লার ইচ্ছা অনুসারেই হয়।

৫. 'আমরা ইচ্ছা করলেই কোন পথে চলতে পারি আবার না-ও পারি' – এরুপ বক্তব্য আবু জেহেলের !

৬. আল্লার ইচ্ছা ছাড়া কেউ কোরান দিয়েও উপকৃত হতে পারবে না।

৭. আল্লার স্বাধীন ইচ্ছার উপরই মানুষের সকল কর্মকান্ড নির্ভরশীল !

এখন প্রশ্ন আসতে পারে আল্লার ইচ্ছা ছাড়া যদি কিছুই না হয়, তাহলে দুনিয়ার এত এত মন্দ কজের স্রষ্টা কে ? সূরা কাহাফের ২৮ নং আয়াতে আল্লা বলছেন –

❒ তুমি নিজকে রাখিবে উহাদিগেরই সংসর্গে যাহারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে উহাদিগের প্রতিপালককে তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করিয়া উহাদিগ হইতে তোমার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইও না। যাহার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করিয়া দিয়াছি, যে তাহার খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে ও যাহার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে তুমি তাহার আনুগত্য করিও না।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা – তাফসীরে মাযহারি, ৭ম খন্ড, পৃঃ ২৫৩

মুতাজিলারা বলে, আল্লাহ্ কেবল শুভকর্মের স্রষ্টা, মন্দ কর্মের নয়। কিন্তু এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, 'যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি'। এতে করে বুঝা যায়, আল্লাহ্তায়ালা শুভ-অশুভ সকল কর্মের একক সৃজয়িতা। এরকম না বলা হলে একাধিক স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণিত হবে এবং তা অবশ্যই হবে স্পষ্টতঃ অংশীবাদিতা বা শিরিক। তাই বিশুদ্ধ বিশ্বাস বহনকারী আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বলেন, একাধিক সৃজকের অস্তিত্ব যেহেতু অসম্ভব, তাই একথা মেনে নিতেই হবে যে, আল্লাহ্তায়ালা ভালো ও মন্দ সকল কাজের একক স্রষ্টা।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আলেমরা একমত যে আল্লাই ভালো ও মন্দ কর্মের একক স্রষ্টা ! আল্লাই যদি পৃথিবীর সব মন্দ কর্ম ডিজাইন করে থাকেন মানুষ কেন সেই মন্দ কর্মের জন্য দায়ী ?

তাফসীরে মাযহারি, ৭ম খন্ড , পৃঃ ২৫৩

লক্ষণীয় যে, পরক্ষণেই আবার বলা হয়েছে, 'যে তার খেয়াল খুশির অনুসরণ করে'। এতে করে বুঝা যায়, বান্দাগণ তাদের কর্মের নির্মাতা। তারা জড় পদার্থতুল্য নয়। তাই বলতে হয়, সৃজন আল্লাহ্র, কিন্তু নির্মাণ মানুষের। তাই তারা পুরোপুরি অকর্মণ্য যেমন নয়, তেমনি নয় সম্পূর্ণ স্বাধীন। তারা আপনাপন কর্মের জন্য সে কারণেই দায়ী। কেননা সৃষ্টি আল্লাহ্র হলেও অর্জন বান্দার।

মানুষ কেন মন্দ কর্মের জন্য দায়ী ? এর ইসলামিক উত্তর হলঃ মন্দ কর্ম আল্লা সৃষ্টি করলেও তা অর্জন করে বান্দা । অর্থাৎ , দুনিয়ার তাবত মন্দ কর্ম সৃষ্টি করে তা আসমান-জমিন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর আগেই মানুষের তাকদীরে লিখে দেন আল্লা , এরপর সেই মন্দ কর্ম ঘটার যখন সময় হয় , তখন সেই তাকদীর অনুসারেই তা ঘটে, যেহেতু তাকদীরের বাইরে যাওয়া কারোর পক্ষেই সম্ভব নয় তাই সেই নির্দিষ্ট মন্দ কর্মটি করতে বান্দা বাধ্য হয় এবং রোবটিক-বান্দা ঐ মন্দ কর্মটি বাস্তবায়ন করে। এই যে সে তাকদীর বাস্তবায়ন করল এটাই বান্দার অর্জন !

যেই কাজটি করলে মানুষ জাহান্নামে যায় , সেই কাজটিই তো মন্দ কর্ম । কিন্তু , আল্লাই মানুষের দ্বারা জাহান্নামিদের কাজ করিয়ে নেন (দ্রষ্টব্য পৃঃ , হাদিস-৯৫) । এমন বক্তব্যের পরও কি মানুষের নিজ কর্ম বলে কিছু থাকে ? বান্দার অর্জন বলে কিছু থাকে ? কিছু করতে বাধ্য করে তার জন্যই আবার দায়ী করা মূলত জোর করে ফাঁদে ফেলা ! যা চরম অসততা !!

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যা কিছু ঘটে তা পূর্ব নির্ধারিত তাক্বদীর অনুযায়ীই ঘটে থাকে।

فَاخْتَصِ عَلَى ذٰلِكَ أَوْ ذَرْ অর্থাৎ তুমি তা কর বা না কর তোমারে ব্যাপারে নির্ধারিত তাক্বদীর বাস্তবায়ন হবেই।

মনে আছে হাদিসগুলো ? ?

বর্তমান আলোচনার সাথে প্রাসঙ্গিক সূরা মায়েদার ৪১ নং আয়াতটি, তাফসীরে মাযহারির ৩য় খন্ডের ৫২৯-৩০ নাম্বার পৃষ্ঠা থেকে দেখা যাকঃ-

'আল্লাহ্ যার পথচ্যুতি চান, তার জন্য আল্লাহ্র নিকট তোমার কিছু করার নেই'— এ কথার অর্থ হে রসুল! আল্লাহ্পাক যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, তার জন্য আপনি কিছুই করতে পারবেন না। আপনাকে এমন ক্ষমতা দেয়া হয়নি যে, আপনি আল্লাহ্র অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্যকে অবদমন করতে পারেন।

মোতাজিলারা বলে, আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য অপরিবর্তনীয় নয়। কিন্তু এ বাক্যটি তাদের অভিমতের বিরুদ্ধে। প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য অপরিবর্তনীয়।

'তাদেরই হৃদয়কে আল্লাহ্ বিশুদ্ধ করতে চান না'— এ কথার অর্থ, আল্লাহ্পাক ইহুদী মুনাফিকদের অন্তরকে কুফরী থেকে পবিত্র করতে চান না। মোতাজিলারা বলে, আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায় ইমান, কুফরী নয়। কিন্তু এ বাক্যটি তাদের বিরুদ্ধে একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মোতাজিলারা হুকুম ও ইচ্ছার মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না। তারা বলে, আল্লাহ্পাক ইমানের নির্দেশ দিয়েছেন, কুফরীর নির্দেশ দেননি। কিন্তু তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধে মানুষ কুফরী ও গোনাহ্ করে থাকে।

এ পৃথিবীতে এভাবে অবিশ্বাসীরা হয়ে ওঠে বিরুদ্ধাচারী। কিন্তু আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায়, তারা ঈমান গ্রহণ করুক। সুতরাং নির্দেশ ও অভিপ্রায় এক নয়। বরং পৃথক। আশায়েরাগণ বলেছেন, পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহ্র নির্দেশ লংঘন করতে পারে। বরং করেই চলেছে। কিন্তু আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায় ভালো ও মন্দ উভয়কে বেষ্টন করে রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায়ের বাইরে ভালো কিংবা মন্দ কোনো কিছুই করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্পাক যদি চান কারো কল্যাণ হোক, তবে সে অকল্যাণের পথে যেতেই পারে না। আর যদি চান কারো অকল্যাণ হোক, তবে তার পক্ষেও কল্যাণের পথে আসা সম্ভব নয়। আলোচ্য বাক্যটিকে আল্লাহ্পাকের সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অপরিবর্তনীয় অভিপ্রায়ের কথাই বলা হয়েছে। যে অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কারো কোনো কিছু করার ক্ষমতা নেই (নবী রসুলগণেরও নেই)। সুতরাং প্রমাণিত হলো, নির্দেশ ও অভিপ্রায়— পৃথক দু'টি বিষয়।

উক্ত আয়াতের আলোচনা থেকে একথা বলা যায় কোরানের বিভিন্ন আয়াতে যে বলেছে- 'মানুষকে সৎ ও অসৎ কাজের জ্ঞান দিয়েছি' (৯১:৮) – এটি একটি উদ্ভটরকমের ফাঁকিবাজি কথা। কেননা, মানুষ ঐ জ্ঞান কাজেই লাগাতে পারবে না। 'আল্লা যার পথচ্যূতি চান' মানুষের জ্ঞানে সেখানে পথপ্রাপ্ত হতে পারবে না। তাই , জ্ঞান আর সক্ষমতার মাঝে রয়েছে আসমান জমিন ফারাক।

তাকদীর প্রসঙ্গে সূরা ইয়াসিন , আয়াত - ১২

আমরা প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট কিতাবে
সংরক্ষিত রেখেছি(১)।

ব্যাখ্যায় – তাফসীরে যাকারিয়া , ১ম খন্ড , পৃঃ ২২১৫

(১) বলা হয়েছে, আমরা প্রত্যেকটি বস্তু সুস্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি। অর্থাৎ লাওহে মাহফূজে। কেননা যা হয়েছে এবং যা হবে সব কিছুই সেখানে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর তা অনুসারেই তাদের ভাল-মন্দ নির্ধারিত হবে। [ইবন কাসীর,মুয়াস্‌সার] সূরা আল-ইসরা এর ১৭ নং আয়াতেরও একই অর্থ।

এবার আমরা আল ইসরার ১৬ নং আয়াতটি [১৭ নং না, ১৬ নং আয়াতটি হবে] দেখে নিব 'শব্দে শব্দে আল কুরান' এর ৭ম খন্ডের ২৩ পৃষ্ঠা থেকে -

শব্দে শব্দে আল কুরআন (২৩) সূরা বনী ইসরাঈল

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ⑮ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ

আর আমি (কোনো জাতির প্রতি) যতক্ষণ না রাসূল পাঠাই আযাব দেই না।[১৭]
১৬. আর যখন আমি ধ্বংস করে দেয়ার ইচ্ছা করি

قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا

কোনো জনপদকে, আমি হুকুম দেই, তার ধনী লোকদেরকে তখন তারা তাতে নাফরমানী করতে থাকে,
অতপর নির্ধারিত হয়ে যায় তার উপর ফায়সালা তখন আমি তা ধ্বংস করে দেই

تَدْمِيرًا ⑯ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ

ধ্বংস করে দেয়ার মত।[১৮] ১৭. আর নূহের পরে কতো যুগের মানুষকেই না
আমি ধ্বংস করে দিয়েছি ; আর আপনার প্রতিপালক যথেষ্ট

وَ-আর ; مَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ-আমি (কোন জাতির প্রতি) আযাব দেই না ; حَتَّى-যতক্ষণ না ; نَبْعَثَ-পাঠাই ; رَسُوْلًا-রাসূল।⑮ وَ- আর ; إِذَا-যখন ; أَرَدْنَا-আমি ইচ্ছা করি ; أَنْ نُهْلِكَ-ধ্বংস করে দেয়ার ; قَرْيَةً-কোন জনপদকে ; أَمَرْنَا-আমি হুকুম দেই ; (مترفى+ها)-مُتْرَفِيْهَا-তার ধনী লোকদেরকে ; فَفَسَقُوْا-তখন তারা নাফরমানী করতে থাকে ; فِيْهَا-তাতে ; فَحَقَّ-অতপর নির্ধারিত হয়ে যায় ; عَلَيْهَا-তার উপর ; (ال+قول)-الْقَوْلُ-ফায়সালা ; (ف+دمرنا+ها)-فَدَمَّرْنٰهَا-তখন আমি তা ধ্বংস করে দেই ; تَدْمِيْرًا-ধ্বংস করে দেয়ার মতো।⑯ وَ-আর ; كَمْ-কত ; أَهْلَكْنَا-আমি ধ্বংস করে দিয়েছি ; (من+ال+قرون)-مِنَ الْقُرُوْنِ-যুগের মানুষকেই না ; مِنْ بَعْدِ-পরে ; نُوْحٍ-নূহের ; وَ-আর ; كَفٰى-যথেষ্ট ; (ب+رب+ك)-بِرَبِّكَ-আপনার প্রতিপালক ;

আল্লা যখন কোন জনপদকে ধবংস করতে চান তখন সেই জনপদের পূর্ব নির্ধারিত ফয়সালা বা তাকদীর বাস্তবায়িত হয় এবং আল্লা তাদের ধবংস করে দেন। উক্ত আয়াতের **‘আমি হুকুম দেই ধনী লোকদের তখন তারা নাফরমানী করতে থাকে’** – এই অংশ নিয়ে ব্যাখ্যাকারকরা পড়ে সমস্যায়। আল্লাকে হুকুমের আসামী থেকে রেহায় দেয়ার জন্য নানাজনে নানা রকম নতুন শব্দসহযোগে চালায় জোড়া তালির শিল্প!

চারটা অনুবাদ থেকে দেখে নেয়া যাক কিভাবে ‘উহ্য’ শব্দের অজুহাতে আল্লাকে দায় মুক্তির জন্য শাব্দিক লুকুচুরির খেলা খেলে ইস্লামিস্টরা –

আর যখন আমি কোন জনপদ ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন তার সম্পদশালীদেরকে (সৎকাজের) আদেশ করি। অতঃপর তারা তাতে সীমালঙ্ঘন করে। তখন তাদের উপর নির্দেশটি সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং আমি তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি। *আল-বায়ান*

আমি যখন কোন জনবসতিকে ধ্বংস করতে চাই তখন তাদের সচ্ছল ব্যক্তিদেরকে আদেশ করি (আমার আদেশ মেনে চলার জন্য)। কিন্তু তারা অবাধ্যতা করতে থাকে। তখন সে জনবসতির প্রতি আমার 'আযাবের ফায়সালা সাব্যস্ত হয়ে যায়। তখন আমি তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে দেই। *তাইসিরুল*

যখন আমি কোন জনপদ ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন ওর সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে সৎ কাজ করতে আদেশ করি, কিন্তু তারা সেখানে অসৎ কাজ করে। অতঃপর ওর প্রতি দন্ডাজ্ঞা ন্যায় সঙ্গত হয়ে যায় এবং আমি ওটাকে সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত করি। *মুজিবুর রহমান*

১৬. আমি যখন কোনো জনপদকে ধ্বংস করতে চাই তখন তার বিত্তশালী লোকদের (ভালো কাজের) আদেশ করি, কিন্তু (তা না করে) সেখানে তারা গুনাহের কাজ করতে শুরু করে, অতপর (এ জন্যে) সেখানে আমার আযাবের ফয়সালা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, পরিশেষে আমি তা সম্পুর্ণরূপে বিনাশ করে দেই।

হলুদ রঙে চিহ্নিত করা শব্দগুলো মূল আয়াতে নেই। এখানে 'আল্লাকে অসৎ কাজের হুকুমদাতা' না বানানোর জন্য কেউ কেউ এমন নতুন শব্দ বাক্যে ঢুকিয়েছে। আল্লার এমন হুকুম ইস্লামিস্টদের সমস্যার কারণই হয়ে দাড়িয়েছে। এই সমস্যা সমাধানে আলেমদের চারটি অভিমত (তাফসিরে যাকারিয়া, ২য় খন্ড, পৃঃ১৪৭৮-৭৯) নিম্মে উল্লেখ করা হল –

১) এখানে أمرنا শব্দের অর্থ, 'নির্দেশ' । সে হিসেবে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, "সেখানকার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে আদেশ করি ফলে তারা সেখানে অসৎকাজ করে" কিন্তু প্রশ্ন হলো, আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে খারাপ কাজের নির্দেশ করেন? তাই এ অর্থ নেয়া হলে যে সমস্যা সৃষ্টি হয় তার সমাধানে আলেমগণ কয়েকটি দিকনির্দেশ করেছেনঃ এক, এখানে 'নির্দেশ' মানে প্রকৃতিগত নির্দেশ ও প্রাকৃতিক বিধান।

এই প্রাকৃতিক বিধান বা ইচ্ছার মানে (সূরা তাকভিরের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) হল –

। পক্ষান্তরে খারাপ কাজ হলে আল্লাহ্র ইচ্ছায় সংঘটিত হলেও তাতে তাঁর সন্তুষ্টি থাকে না। এটাকে বলা হয় 'আল্লাহ্র প্রাকৃতিক ইচ্ছা'।

অর্থাৎ , আল্লা প্রদত্ত খারাপ কাজের নির্দেশটাই হল প্রকৃতিগত বা প্রাকৃতিক নির্দেশ।

নির্দেশ দেয়ার অর্থ অসৎকাজের নির্দেশ নয়। বরং এখানে একটি বাক্য উহ্য আছে। তাহলো, "সেখানকার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে সৎকাজের নির্দেশ করি কিন্তু তারা অসৎকাজে লিপ্ত হলে আমি তাদেরকে ধ্বংস করি।" তখন এ নির্দেশটি শর'য়ী নির্দেশ বলে বিবেচিত হবে। [ইবন কাসীর]

আল্লা যা বলেনি সেই অতিরিক্ত শব্দ যোগ করে মানে উহ্য শব্দ দিয়ে জোড়াতালি দিয়ে হলেও কোরানের আয়াতকে কারেকশন বা সংশোধন করে শরয়ী নির্দেশ বিবেচনা করতে হবে ! উহ্য শব্দ ব্যবহারের ফলে উক্ত আয়াতে 'অসৎ কাজের দায়গত' পরিবর্তন চলে আসে।

যদি বলা হয়ঃ-

'সেখানকার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে আদেশ করি ফলে তারা সেখানে অসৎ কাজ করে' – এখানে অসৎ কাজের দায় আল্লার , কারণ তিনি আদেশ করেছে যা বান্দার জন্য অলঙ্ঘনীয়।

আবার উহ্য শব্দ যোগে যদি বলা হয়ঃ-

'সেখানকার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে সৎকাজের নির্দেশ করি কিন্তু তারা অসৎকাজে লিপ্ত হলে আমি তাদেরকে ধ্বংস করি' – এখানে অসৎ কাজের দায় বর্তায় বান্দার উপর।

এমনতর উহ্য শব্দ ব্যবহার করে বাক্যে ব্যক্তির কর্মের দায়গত পরিবর্তন নিয়ে আসা কোন সৎ বা যৌক্তিক মানুষের কাজ হতে পারে না। অসৎ কাজের নির্দেশের দায় থেকে আল্লাকে মুক্ত রাখার জন্যই উহ্য শব্দের আমদানি, আশা করি বিষয়টা পরিষ্কার হয়েছে।

আলেমদের পরবর্তী তিনটা সমস্যা সমাধানমূলক অভিমত হলঃ-

২) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি أمرنا শব্দের অর্থ করেছেন سلطنا তখন অর্থ হবে, 'যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করতে চাই তখন তাদের উপর খারাপ লোকদের ক্ষমতায়ন করি ফলে তারা সেখানে আমার নাফরমানী করার কারণে তাদেরকে আমি ধ্বংস করি। [ইবন কাসীর]

৩) হাসান, কাতাদা সহ আরও অনেকে বলেন, أمرنا অর্থ بعثنا অর্থাৎ তাদের উপর এমন খারাপ লোকদের চড়াও করি যাতে তারা ধ্বংস হওয়ার কাজ করে। ফলে তাদের আমি ধ্বংস করি। [ফাতহুল কাদীর]

৪) ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ও কাতাদা রাহেমাহুল্লাহ বলেন, এখানে أمرنا অর্থ أكثرنا অর্থাৎ তাদের মধ্যে আমি আধিক্য দান করি। ফলে আল্লাহকে ভুলে যায় এবং নাফরমানী করতে থাকে যাতে তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে। জাহেলিয়াতের যুগে যখন কোন গোত্রের লোক বেড়ে যেত এবং শক্তি বৃদ্ধি পেত তখন বলা হতো, أَمِـرَ بَنُوْ فُلَانٍ সে হিসেবে এখানেও একই অর্থ নেয়া হবে। [বুখারীঃ ৪৭১১]

তাদের উপর খারাপ লোকদের ক্ষমতায়ন করি , এমন খারাপ লোকদের চড়াও করি, তাদের মধ্যে আমি আধিক্য দান করি – এই বাক্যাংশগুলোও কতৃত্ববাচক বাক্য। যার ফলে বোঝা যায় কাউকে কিছু করতে বাধ্য করা হচ্ছে। অধিকাংশ অনুবাদক ও ব্যাখ্যাকারক সূরা ইসরা বা বনি ইসরাইলের এই ১৬ নং আয়াতের ভ্রান্ত অনুবাদ করেছে তবে তাফসিরে যাকারিয়ার লেখক এক্ষেত্রে সততার পরিচয় দিয়েছে। সঠিক অনুবাদটি হলঃ-

وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا۟ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَٰهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾

১৬. আর আমরা যখন কোন জনপদ ধ্বংস করতে চাই তখন সেখানকার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে আদেশ করি[১], ফলে তারা সেখানে অসৎকাজ করে[১]; অতঃপর সেখানকার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা ন্যায়সংগত হয়ে যায় এবং আমরা তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি[২]।

এভাবে অনুবাদ করলে স্পষ্টতই বোঝা যায় আল্লা বান্দাদের অসৎ কাজ করতে বাধ্য করে , এই সমস্যাটি তাফসিরকারকও বুঝতে পেরেছেন । তাই উক্ত আয়াতের শেষাংশের ব্যাখ্যায় ২য় খন্ডের ১৪৭৯-৮০ পৃষ্ঠায় মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও ইচ্ছা শক্তির কথা টেনে এনেছেন যা ইসলামিক বিশ্বাস মতে ধোপে টিকে না !

সেখানে লিখেছেঃ

আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে এরূপ সন্দেহের অবকাশ ছিল যে, তাদেরকে ধ্বংস করাই ছিল আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্য। তাই প্রথমে তাদেরকে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে ঈমান ও আনুগত্যের আদেশ দেয়া অতঃপর তাদের পাপাচারকে আযাবের

কারণ বানানো এসব তো আল্লাহ্ তাআলারই পক্ষ থেকে হয়। এমতাবস্থায় বেচারাদের দোষ কি? তারা তো অপারগ ও বাধ্য। এর জওয়াব হলো, আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি ও ইচ্ছা শক্তি দান করেছেন এবং আযাব ও সওয়াবের পথ সুস্পষ্টভাবে বাতলে দিয়েছেন। কেউ যদি স্বেচ্ছায় আযাবের পথে চলারই ইচ্ছা

'বিবেক-বুদ্ধি , ইচ্ছা শক্তি' এসব অযৌক্তিক হয়ে যায় যখন আমরা সূরা তাকভীরের ২৯ নং আয়াতটি দেখি - বান্দার ইচ্ছা আল্লার ইচ্ছা অনুসারেই হয় । ইয়াসিনের ১২ নং আয়াতের ব্যাখ্যানুযায়ী – তাকদীর অনুযায়ীই বান্দার ভালো-মন্দ নির্ধারিত হয় এবং তাকদীর সম্পর্কিত হাদিসগুলো বিবেচনায় নিলে মানুষের ইচ্ছার কার্যকারিতাই থাকে না । কেননা , বান্দা তো আল্লার ইচ্ছা ব্যতিরেকে ইচ্ছাই করতে পারছে না ।

তাকদীর নিয়ে সূরা হাজ্জের ৭০ নং আয়াতটি হলঃ

৭০. আপনি কি জানেন না যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ্ তা জানেন। এসবই তো আছে এক কিতাবে[২]; নিশ্চয় তা আল্লাহ্‌র নিকট অতি সহজ।

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা – তাফসিরে যাকারিয়া

(২) আল্লাহ্ তা'আলা এখানে তাঁর সৃষ্টিকুল সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানের কথা জানাচ্ছেন। আর এও জানাচ্ছেন যে, আসমান ও যমীনের সবকিছুকে তাঁর জ্ঞান ঘিরে আছে। তা থেকে ছোট কিংবা বড় সামান্যতম জিনিসও বাদ পড়ে না। তিনি সৃষ্টিকুলের সবকিছু সেগুলোর অস্তিত্বের আগ থেকেই জানেন। আর তিনি সেগুলো লাওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন। যেমন হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই সৃষ্টিকুলের তাকদীর লিখে রেখেছেন। আর তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপর"। [মুসলিম: ২৬৫৩] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্ যখন কলম সৃষ্টি করলেন, তখন তাকে বললেন, লিখ। কলম বলল, কি লিখব? আল্লাহ্ বললেন, যা হবে সবই লিখ। তখন কিয়ামত পর্যন্ত যা হবে তা লিখতে কলম চালু হল।" [মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩১৭] এ সবই আল্লাহ্র পূর্ণ জ্ঞানের প্রমাণ যে, তিনি সবকিছু হওয়ার আগেই তা জানেন। আর তিনি সেটা নির্ধারণ করেছেন এবং লিখে রেখেছেন। সুতরাং বান্দারা যা করবে, কিভাবে করবে সেটা তাঁর জ্ঞানে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান। সৃষ্টির আগেই জানেন যে, এ সৃষ্টি তার ইচ্ছা অনুসারে আমার আনুগত্য করবে, আর এ সৃষ্টি তার ইচ্ছা অনুসারে আমার অবাধ্য হবে। আর তিনি সেটা লিখে রেখেছেন এবং জ্ঞানে সবকিছু পরিবেষ্টন করে আছেন। এটা তাঁর জন্য সহজ ও অনায়াসসাধ্য। [ইবন কাসীর]

তাকদীর সম্পর্কিত সূরা হিজর আয়াত ২১ –

❒ আমার নিকট আছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার এবং আমি উহা প্রয়োজনীয় পরিমাণেই সরবরাহ করিয়া থাকি।

ব্যাখ্যায় – তাফসিরে মাযহারি, ৬ষ্ঠ খন্ড

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমি তা প্রয়োজনীয় পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি।' একথার অর্থ— আমার অপার প্রজ্ঞাবলে সৃষ্টির যে অদৃষ্টলিপি আমি প্রস্তুত করেছি, সেই অদৃষ্টলিপি অনুসারে আমি সৃষ্টির অনস্তিত্বকে অস্তিত্ব দান করি।

তাকদীর নিয়ে সূরা ফুরকানের ২ নং আয়াত –

❒ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁহারই; তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই; সার্বভৌমিকত্বে তাঁহার কোন অংশী নাই। তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেককে যথোচিত প্রকৃতি দান করিয়াছেন।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা – তাফসিরে মাযহারি , ৮ম খন্ড

কোনো কোনো আলেম এখানকার 'প্রত্যেকের যথোচিত প্রকৃতি দান করেছেন' কথাটির অর্থ করেছেন—আল্লাহ্ সকলের ও সকলকিছুর আয়ু, কর্মপরিধি ও জীবনোপকরণ নির্ধারণ করেছেন তাদের অস্তিত্বপ্রাপ্তির আগেই। সেই নির্ধারণানুসারেই বাস্তবায়িত হয়ে চলেছে তাদের উত্থান, অর্জন ও বিলয়।

এবার আমরা সূরা ফাতিরের ৮ নং আয়াতটি দেখি –

৮. কাউকে যদি তার মন্দকাজ শোভন করে দেখানো হয় ফলে সে এটাকে উত্তম মনে করে, (সে ব্যক্তি কি তার সমান যে সৎকাজ করে?) তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছে হিদায়াত করেন[১]। অতএব তাদের জন্য আক্ষেপ করে আপনার প্রাণ যেন ধ্বংস না হয়। তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত।

أَفَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ فَرَءَاهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَٰتٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝٨

এই আয়াতের ব্রেকেটের অংশটুকু অনুবাদকের নিজস্ব সংযোজন, যা মূল আয়াতে নেই। এই আয়াতে দেখতে পেলাম আল্লাই মানুষের চোখে মন্দকাজকে সুন্দর করে দেখায় আর এর জন্যই মানুষের বোধ-বুদ্ধি হয়ে যায় বিকৃত। আল্লাই মানুষকে এভাবে বিভ্রান্ত করে দায় চাপায় শয়তানের উপর। যা বড়ই হাস্যকর দায়মুক্তি ! উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যাটুকু দেখব তাফসিরে মাযহারির ৯ম খন্ড থেকেঃ-

এখানে 'ফারাআহু হাসানান্' অর্থ তাকে দেখানো হয় শোভনরূপে। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক যাকে সহায়তাবিহীন অবস্থায় পরিত্যাগ করেন, তার বোধ-বুদ্ধি-বিবেক হয়ে যায় বিকৃত। তখন তার চোখে অসুন্দরকেই সুন্দর বলে মনে হয় এবং সুন্দরকে মনে হয় অসুন্দর। শয়তানই তাকে এরকম বিকৃত রুচিসম্পন্ন করে তোলে। এধরনের লোক কি ওই সকল মানুষের সমমর্যাদাসম্পন্ন কখনো হতে পারে, যারা শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত, প্রকৃতই সৎকর্মশীল?

তাফসীরে ইবনে কাছির ৯ম খন্ডঃ-

فَإِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ অর্থাৎ যাহার জন্য যে পথ পূর্ব হইতে নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন সেই অনুযায়ী যাহাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন যাহাকে ইচ্ছা হেদায়ত করেন।

যার পথভ্রষ্টতা পূর্ব হতেই নির্ধারিত তার ইচ্ছা শক্তি বোধ-বুদ্ধিতো অকেজো !

তাকদীর নিয়ে সূরা কালামের ১ নং আয়াতটি দেখিঃ

১. নূন---শপথ কলমের[১] এবং তারা যা লিপিবদ্ধ করে তার,	نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۙ﴿١﴾

ব্যাখ্যায় – তাফসীরে যাকারিয়া, পৃঃ ২৬৬৮

মুজাহিদ বলেন, কলম মানে যে কলম দিয়ে যিক্‌র অর্থাৎ কুরআন মজীদ লেখা হচ্ছিলো।[কুরতুবী] কলম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-বলেন, "সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলা কলম সৃষ্টি করে তাকে লেখার আদেশ করেন। কলম বলল, কি লিখব? তখন আল্লাহ্ বললেন, যা হয়েছে এবং যা হবে তা সবই লিখ। কলম আদেশ অনুযায়ী অনন্তকাল পর্যন্ত সম্ভাব্য সকল ঘটনা ও অবস্থা লিখে দিল।" [মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩১৭] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টির তাকদীর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে লিখে দিয়েছিলেন।" [মুসলিম: ২৬৫৩, তিরমিযী: ২১৫৬, মুসনাদে আহমাদ: ২/১৬৯] কুরআনের অন্যত্রও এ কলমের উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "তিনি (আল্লাহ্) কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন"। [সূরা আল-আলাক: ৪]।

সূরা সাফফাত ,আয়াত ৯৬ , মানুষের কাজ-কর্মের স্রষ্টা কে ?

৯৬. অথচ আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরী কর তাও[১] ।’	وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

ব্যাখ্যায় – তাফসীরে যাকারিয়া , পৃঃ ২২৪৮

(১) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ্ই প্রত্যেক শিল্পী ও তার শিল্পকে তৈরী করেন’ [মুস্তাদরাকে হাকিম: ১/৩১] অর্থাৎ মানুষের কাজের স্রষ্টাও আল্লাহ্ । [আত-তাফসীরুস সহীহ]

আরেকটি ব্যাখ্যা – তাফসীরে মাযহারি , ১০ম খন্ড, পৃঃ ৯৪

তাফসীরে মাযহারী/৯৪

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— ‘তোমরা নিজেরা যাদেরকে খোদাই করে নির্মাণ করো তোমরা কি তাদেরকেই পূজা করো (৯৫)? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরী করো তা-ও’ (৯৬)।

এখানকার প্রথমোক্ত আয়াতে উল্লেখিত প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। পরের আয়াতের বক্তব্য সেই অস্বীকৃতিকে করেছে অধিকতর গুরুত্ববহ। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— স্বসৃষ্ট কোনোকিছু কি পূজা পাবার যোগ্য? কখনোই নয়। পূজা পাবার যোগ্য কেবল সেই আল্লাহ্, যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ এবং তাদের কর্মকাণ্ডসমূহ।

এখানকার ‘ওয়ামা তা’মালূন’ (তোমরা যা তৈরী করো তা-ও) এর ’মা’ হচ্ছে ক্রিয়ামূল। অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের এবং তোমাদের কাজকর্মেরও স্রষ্টা। তাহলে তোমরা সেই একক মহাসৃজয়িতাকে ছেড়ে এমন কিছুর উপাসনা করো কেনো, যারা তোমাদেরই মুখাপেক্ষী।

আশায়েরা সম্প্রদায়ের বিজ্ঞবিদ্বানগণ বলেন— মানুষের সকল কাজ আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেন। এই আয়াত তার প্রমাণ। আর পথভ্রষ্ট মুতাজিলারা বলে, বান্দা নিজেই তার কর্মের স্রষ্টা। তাদের কাছে এখানকার ‘মা তা’মালূন’ এর ‘মা’ যোজক অব্যয়। সর্বনামটি উহ্য। নিঃসন্দেহে তাদের এরকম ধারণা অযথার্থ। কেননা এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে— প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরী করো তা-ও। সুতরাং বুঝতে হবে, মানুষ কেবল আকার আকৃতির নির্মাতা, অথবা আবিষ্কারক। কিন্তু স্রষ্টা কদাচ নয়। সৃজন সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র। আবার মানুষ যে বুদ্ধি ও শক্তি সামর্থ দিয়ে মূর্তি বানায় এবং যে সকল উপাদান কর্মে ব্যবহার করে সে সকল কিছুর স্রষ্টাও তো আল্লাহ্। তাই একথাও স্বীকার করতে হবে যে, সৎ ও অসৎ কর্মের নির্মাতা হিসেবেই মানুষকে চিহ্নিত করা হবে পুণ্যবান অথবা পাপীরূপে। তাদের কর্মাবলীর স্রষ্টা হিসেবে নয়।

এরকমও হতে পারে যে, এখানকার ‘মা’ ক্রিয়ামূল হলেও শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে কর্মপদীরূপে। যদি তাই হয় তবে এখানকার ‘তা’মালূন’ হয়ে যাবে ‘তানহিতুন’ (তোমাদের সহস্ত নির্মিত) এর মতো। অর্থাৎ ওই মূর্তিনির্মাতারা ছিলো কাফের এবং স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে তারা অপ্রকৃতিস্থিতপ্রায়। তা না হলে কি আর তারা স্বনির্মিত কোনো কিছুর উপাসক হয়?

আশায়েরা ইমামগণের প্রথমোক্ত ব্যাখ্যা সঠিক। আর মুতাজিলা সম্প্রদায়ের উভয় ব্যাখ্যাই ভুল। কেননা তাদের ধারণা অস্বচ্ছ ও অন্তঃসারশূন্য। কাজের নির্মাণনৈপুণ্যও তো আল্লাহ্র দান। সুতরাং মুতাজিলাদের ব্যাখ্যানুসারে আকৃতির সৃষ্টিও মানুষের স্বসৃষ্ট কর্ম বলে প্রমাণিত হয় না, বরং সেটা তাদের অভ্যাস, অথবা শ্রমপরিণাম। এতে করে বরং এটাই প্রমাণিত হয় যে, অন্য সকল কিছুর মতো আকার আকৃতির স্রষ্টাও আল্লাহ্ স্বয়ং।

সূরা যুমার , আয়াত ৬২

৬২. আল্লাহ্ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর তত্ত্বাবধায়ক ।	اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَیۡءٍ ۫ وَّ هُوَ عَلٰی كُلِّ شَیۡءٍ وَّكِیۡلٌ ﴿۶۲﴾

ব্যাখ্যায় - তাফসিরে মাযহারি, ১০ম খন্ড, পৃঃ ২৮৫

এরপরের আয়াতে (৬২) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সমস্তকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্তকিছুর কর্মবিধায়ক'। এখানে 'আল্লাহ্ সমস্তকিছুর স্রষ্টা' অর্থ এই বিশ্বের অনুকূল-প্রতিকূল সকলকিছুরই তিনি একক স্রষ্টা। যেমন ভালো-মন্দ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস। সৃজন সম্পূর্ণতই তাঁর। আলোচ্য আয়াতের সম্পর্ক রয়েছে ৪২ সংখ্যক আয়াতের 'আল্লাহ্ই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের.........' এর সঙ্গে। মধ্যবর্তী বক্তব্যগুলি ভিন্ন প্রসঙ্গের।

'ওয়াকিল' অর্থ কর্মবিধায়ক, সংরক্ষক। অর্থাৎ সকলে ও সকলকিছুই তাঁর অভিপ্রায়ানুগামী ও বিধানানুগত।

এখানে আমরা জানলাম , আল্লা সবকিছুর স্রষ্টা শুধু নন তত্ত্বাবধায়কও । অর্থাৎ , যা কিছু হয়েছে , হচ্ছে এবং হবে সবকিছু আল্লার তত্ত্বাবধানে মানে নির্দেশনায় হয়েছে , হচ্ছে এবং হবে । আত্মহত্যা , গণহত্যা , ধর্ষণ , শিশুধর্ষণ , গণধর্ষণ , ইভটিজিং , ডাকাতি , ছিনতাই , গুন্ডামি , ঘুষ , দুর্নীতি ইত্যাকার বড় বড় অপরাধও নিশ্চয় উক্ত আয়াতে উল্লেখিত 'সমস্ত কিছুর' অর্ন্তভুক্ত ! আল্লা সকল কিছুর তত্ত্বাবধায়ক হলে হিটলারের গণহত্যার তত্ত্বাবধায়ক কে ? ১৯৭১ সালের নিরস্ত্র বাঙালীর উপর রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয়া মুক্তিযুদ্ধের এবং লাখো বাঙালী নারীর ধর্ষণের তত্ত্বাবধায়ক কে ? এই মহান আয়াত অনুযায়ী নিশ্চয় আল্লাই ।

সূরা হাদীদ , আয়াত ২২

২২. যমীনে বা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয়ই আসে তা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই আমরা তা কিতাবে লিপিবদ্ধ রেখেছি ।[১] নিশ্চয় আল্লাহ্‌র পক্ষে এটা খুব সহজ ।	مَاۤ اَصَابَ مِنۡ مُّصِیۡبَۃٍ فِی الۡاَرۡضِ وَ لَا فِیۡۤ اَنۡفُسِكُمۡ اِلَّا فِیۡ كِتٰبٍ مِّنۡ قَبۡلِ اَنۡ نَّبۡرَاَهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَی اللّٰهِ یَسِیۡرٌ ﴿۲۲﴾

ব্যাখ্যায় – তাফসীরে যাকারিয়া , পৃঃ ২৫৮২

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, যমীনের বুকে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপদাপদ আসে, তা সবই আমি কিতাবে অর্থাৎ লওহে-মাহফুযে জগত সৃষ্টির পূর্বেই লিখে দিয়েছিলাম। যমীনের বুকে সংঘটিত বিপদাপদ বলে দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, ফসলহানি, বাণিজ্যে ঘাটতি, ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়া, বন্ধু-বান্ধবের মৃত্যু ইত্যাদি এবং ব্যক্তিগত বিপদাপদ বলে সর্বপ্রকার রোগ-ব্যাধি, ক্ষত, আঘাত ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

সূরা আল মুমিনুন , আয়াত ৬৩

৬৩. বরং এ বিষয়ে তাদের অন্তর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন, এছাড়াও তাদের আরো কাজ আছে যা তারা করছে[১]।

بَلْ قُلُوْبُهُمْ فِيْ غَمْرَةٍ مِّنْ هٰذَا وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عٰمِلُوْنَ ۝

ব্যাখ্যায় – তাফসিরে যাকারিয়া , ১৮২৮

(১) অর্থাৎ তাদের পথভ্রষ্টতার জন্য শির্ক ও কুফরের আবরণই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তারা এতেই ক্ষান্ত ছিল না। বরং অন্যান্য কুকর্মও অনবরত করে যেত। [ইবন কাসীর] কারও কারও মতে এর অর্থ, তাদের তাকদীরে আরও কিছু খারাপ কাজ করবে বলে লিখা রয়েছে। সুতরাং তারা তাদের মৃত্যুর পূর্বে সেটা করবেই। যাতে করে তাদের উপর আযাবের বাণী সত্য পরিণত হয়। ইবন কাসীর বলেন, এ মতটি প্রকাশ্য এবং শক্তিশালী। তিনি এর সপক্ষে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যাতে এসেছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে সত্তা ব্যতীত কোন ইলাহ নেই তার শপথ, কোন লোক আমল করে যেতে থাকে, এমনকি তার ও জান্নাতের মধ্যে মাত্র এক গজ দূরত্ব থাকে, তখনি তার কিতাব তথা তাকদীরের লেখা এগিয়ে আসে আর সে জাহান্নামের আমল করে জাহান্নামে প্রবেশ করে।" [বুখারী: ৩২০৮; মুসলিম: ২৬৪৩] সুতরাং কেউ যেন নিজের আমল নিয়ে গর্ব বা অহংকার না করে। বরং সর্বদা আল্লাহ্ ভয়ে ভীত ও তাঁর কাছে নত থাকে।

যেই রাসুল এত এত তাকদীরের হাদিস শুনালেন তিনিই আবার তাকদীরের দোহায় শুনতে নারাজ , একটা পাতা নড়াও তাকদীরে লেখা থাকে সেই হিসেবে তো যে তাকদীরের দোহায় দিচ্ছে সেটাও তার তাকদীরেই লেখা ছিল !

তাফসীরে যাকারিয়া, পৃষ্ঠা – ১৫৭২

অন্য এক হাদীসে এসেছে,

'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন আলী ও ফাতেমাকে দেখতে গিয়েছিলেন, তাদেরকে তিনি বললেনঃ তোমরা রাতে সালাত আদায় কর না? তারা বললেনঃ আমরা ঘুমোলে আল্লাহ্ আমাদের প্রাণ হরণ করে তাঁর হাতে নিয়ে নেন। সুতরাং আমরা কিভাবে সালাত আদায় করব? তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে গেলেন, তারপর তাকে শুনলাম তিনি ফেরা অবস্থায় নিজের রানে আঘাত করছেন আর বলছেন, মানুষ ভীষণ ঝগড়াটে।' [বুখারীঃ ১১২৭, ৪৭২৪, মুসলিমঃ ৭৭৫] এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী ও ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার পক্ষ থেকে এ ধরনের বিতণ্ডা অপছন্দ করলেন। কারণ, এটা বাতিল তর্ক। মহান আল্লাহ্র আনুগত্য না করার জন্য তাকদীরের দোহাই দেয়া জায়েয নেই।

সূরা বাকারা, আয়াত ১০২

১০২. আর সুলাইমানের রাজত্বে শয়তানরা যা আবৃত্তি করত তারা তা অনুসরণ করেছে। আর সুলাইমান কুফরী করেননি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে শিক্ষা দিত জাদু ও (সে বিষয় শিক্ষা দিত) যা বাবিল শহরে হারূত ও মারূত ফিরিশ্তাদ্বয়ের উপর নাযিল হয়েছিল। তারা উভয়েই এই কথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, 'আমরা নিছক একটি পরীক্ষা; কাজেই তুমি কুফরী করো না'[১]। তা সত্বেও তারা ফিরিশ্তাদ্বয়ের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত যা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতো[১]। অথচ তারা আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত তা দ্বারা কারো ক্ষতি করতে পারত না। আর তারা তা-ই শিখত যা তাদের ক্ষতি করত এবং কোন উপকারে আসত না। আর তারা নিশ্চিত জানে যে, যে কেউ তা খরিদ করে, (অর্থাৎ জাদুর আশ্রয় নেয়) তার জন্য আখেরাতে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিকিয়ে দিচ্ছে, তা খুবই মন্দ, যদি তারা জানত!

ব্যাখ্যায় – তাফসিরে যাকারিয়া, পৃঃ ১০১

জাদুর বাস্তবতা রয়েছে। ফলে মানুষ কখনো এর মাধ্যমে অসুস্থ হয়ে পড়ে, কখনো নিহতও হয় এবং এর দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতাও সৃষ্টি করা যায়। তবে এর প্রতিক্রিয়া তাকদীরের নির্ধারিত হুকুম ও আল্লাহ্র অনুমতিক্রমেই হয়ে থাকে। এটা পুরোপুরি শয়তানী কাজ।

'যাদু বাস্তব' – এমন উদ্ভট কথা বলেই ধর্ম কুসংস্কার ছড়িয়ে থাকে। ইসলাম মতেই জাদু একটা শয়তানি কাজ অথচ এই শয়তানি কাজের প্রতিক্রিয়াটাও আল্লার হুকুম ও অনুমতিতেই হয় যা লেখা থাকে তাকদীরে !

শয়তান যে আল্লার অনুমতিতে শুধু মানুষের অনিষ্ট করে এতটুকুই নয় , শয়তানকে মানুষের পিছে লেলিয়েও দিয়েছে ।

সূরা হা মিম সাজদা , আয়াত ২৫ , তাফসীরে মাঝহারি ১০ম খন্ড , পৃঃ ৩৯২

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'আমি তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সহচর, যারা তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা আছে, তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখিয়েছিলো এবং তাদের ব্যাপারেও তাদের পূর্ববর্তী জ্বিন ও মানুষের ন্যায় শাস্তির বাণী বাস্তব হয়েছে। তারা তো ছিলো ক্ষতিগ্রস্ত'। একথার অর্থ— তাদের পৃথিবীর জীবনে আমি তাদের জন্য সহচররূপে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম কতিপয় শয়তানকে। ওই শয়তানেরাই তাদের সকল কার্যকলাপকে তাদের দৃষ্টিতে মনোহররূপে প্রতিভাত করতো। পূর্ববর্তী যুগের ওই জ্বিন ও মানব বংশোদ্ভূত শয়তানগুলোকেও আমি প্রবেশ করাবো নরকে। আর তাদের প্ররোচিত ও প্ররোচক সকলেই ছিলো ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূত।

মানুষ যে ঈমান আনবে না এটাও তাকদীরেই লেখা থাকে ; সূরা ইয়াসিন, আয়াত ৭

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

৭. তাদের অধিকাংশের জন্যে সেই বাণী অবধারিত হয়েছে; সুতরাং তারা ঈমান আনবে না।

ব্যাখ্যায় – তাফসীরে ইবনে কাছির , ৯ম খন্ড , পৃঃ ৩৩০

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ ইব্ন জারীর (রা) বলেন, এই আয়াতের অর্থ এই যে, তাহাদের অধিকাংশের ওপরে শাস্তি অবতীর্ণ হইবার বিষয়াদি স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে। কারণ উম্মুল কিতাব ও লাওহে মাহফুজেই আল্লাহ্ তা'আলা এই সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, তাহারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনিবেনা ও তাহার রাসূলগণকে রাসূল হিসেবে মান্য করিবে না।

সূরা সাজদাহ , আয়াত ১৩ ; তাফসীরে মাঝহারি ৯ম খন্ড , পৃঃ ৩৭৬

পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতাম, কিন্তু আমার কথা অবশ্যই সত্যঃ আমি নিশ্চয় জ্বিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবো'। একথার অর্থ— আমি যদি ইচ্ছা করতাম, তবে অবশ্যই প্রত্যেক মানুষ ও জ্বিনকে করতে পারতাম সত্যপথানুসারী। কিন্তু আমার স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত এই যে, আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবোই। আর পূর্ণ করবো অবিশ্বাসী মানুষ ও জ্বিনদের দ্বারা'।

এখানে 'মিনাল জ্বিন্নাতি ওয়ান্নাস' (জ্বিন ও মানুষ উভয় দ্বারা) বাক্যটির 'আলিফ-লাম' সীমিত অর্থবোধক। এর দ্বারা সীমায়িত করা হয়েছে মানুষ ও জ্বিন সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবল পাপিষ্ঠদেরকে। জননী আয়েশার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, কোনো কোনো মানুষ জন্মপূর্ব থেকে পিতার পৃষ্ঠদেশে থাকার সময়েই দোজখীরূপে নির্ধারিত এবং কোনো কোনো মানুষ বেহেশতী বলে স্থিরীকৃত জন্মপূর্ব সময় থেকেই, যখন তারা অবস্থান করে তাদের পিতার পৃষ্ঠদেশে।

সূরা ইউনুস , আয়াত ৯৬ ; তাফসীরে মাঝহারি ৫ম খন্ড , পৃঃ ৬৪৯

এর পরের আয়াতে (৯৬) বলা হয়েছে— 'যাদের বিরুদ্ধে তোমার প্রতি-পালকের বাক্য সত্য হয়েছে তারা বিশ্বাস করবে না।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! জেনে রাখুন, যারা চিরভ্রষ্ট, মহা ন্যায়পরায়ণ আল্লাহ্‌র অসীম জ্ঞানানুসারে চিরস্থায়ী সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরূপে যারা চিহ্নিত ও নির্ধারিত, তারা কখনোই ইমান আনবে না।

এখানে 'কালিমাতু রব্বি' (তোমার প্রতিপালকের বাক্য) কথাটির অর্থ চিরন্তন নির্ধারণ। হজরত মুসলিম বিন ইয়াসার থেকে মালেক, তিরমিজি ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত ওমরকে 'ওয়া ইজ আখাজা রব্বুকা মিম্ বানী আদামা মিন্ জুহুরিহিম জুর্‌রিয়াতাহুম' এই আয়াতের অর্থ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলো। তিনি বললেন, আমিও এ বিষয়ে রসুল স.কে প্রশ্ন করেছিলাম। উত্তরে তিনি স. বলেছিলেন, আল্লাহ্‌পাক আদমকে সৃষ্টি করলেন। তারপর তাঁর পৃষ্ঠদেশের উপর তাঁর অলৌকিক হস্ত স্পর্শ করলেন। তখন সমুদ্ভাসিত হলো আদমের অনাগত বংশধরের একটি দল। আল্লাহ্ বললেন, এদেরকে আমি জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি। পৃথিবীতে এরা জান্নাতবাসীদের মতোই আমল করবে। এরপর আল্লাহ্ পুনরায় আদমের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করলেন। এবার সমুদ্ভাসিত হলো আদমের অনাগত বংশধরদের আরেকটি দল। আল্লাহ্ বললেন, এদেরকে সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য। পৃথিবীতে এরা জাহান্নামীদের মতোই কাজ করবে।

আবু নাসেরার মাধ্যমে ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু আবদুল্লাহ্ বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তাঁর অলৌকিক ও আনুরূপ্যবিহীন দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বলেন, এই মুঠোর মধ্যে যারা তারা জান্নাতী আর এই মুঠোর মধ্যে যারা তারা জাহান্নামী— আমি কারো পরওয়া করি না।

সূরা সাফফাত , আয়াত ৩০-৩১ ; তাফসীরে মাঝহারি , ১০ম খন্ড , পৃঃ ৭৪

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিপালকের কথা সত্য হয়েছে, আমাদেরকে অবশ্যই শাস্তি আস্বাদন করতে হবে (৩০)। আমরা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম, কারণ আমরা নিজেরাও ছিলাম বিভ্রান্ত (৩১)। একথার অর্থ— তাদের নেতৃবর্গ শেষে তাদের নিজেদের দোষও স্বীকার করবে। বলবে, দ্যাখো। তোমরা আমরা উভয়েই অপরাধী। এখন শাস্তিভোগ আমাদের জন্য অনিবার্য। আমরা পথভ্রষ্ট ছিলাম। সেজন্যই তো তোমাদেরকে আহ্বান জানাতাম পথভ্রষ্টতার দিকে। তোমরাও সে আহ্বানে হৃষ্টচিত্তে সাড়া দিয়েছো। এভাবে এখন আমাদের উপরে বাস্তবায়িত হবে আল্লাহ্‌র পূর্বঘোষিত বাণী, আর আল্লাহ্‌র বাণী তো সত্য।

উল্লেখ্য, এখানে 'আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিপালকের কথা সত্য হয়েছে' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে ওই আয়াতের দিকে, যেখানে বলা হয়েছে 'আমি জাহান্নামকে পরিপূর্ণ করবো জ্বিন, ইনসান ও পাথর দ্বারা'। এভাবে তাদের একথার অর্থ দাঁড়িয়েছে— দ্যাখো, তোমাদের ও আমাদের পথভ্রষ্টতা ভাগ্যের ফের ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের নরকগমন অদৃষ্টলিপিতে পূর্বাহ্নেই লিপিবদ্ধ ছিলো। পৃথিবীতে পথভ্রষ্ট করে ও হয়ে আমরা তা বাস্তবায়ন করেছি মাত্র। আমরা যে চিরভ্রষ্ট।

সূরা যুমার , আয়াত ১৯ ; তাফসীরে মাঝহারি ১০ম খন্ড , পৃঃ ২৩৮

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'যার উপর দণ্ডাদেশ অবধারিত হয়েছে, তুমি কি রক্ষা করতে পারবে সেই ব্যক্তিকে? যে জাহান্নামে আছে'? একথার অর্থ— হে আমার রসুল! বলুন তো দেখি, যে লোক চিরভ্রষ্ট, যার জন্য আল্লাহ্‌র চিরন্তন জ্ঞানে শাস্তি সুনির্ধারিত এবং যে আল্লাহ্‌র অবগতিতে দোজখের মধ্যেই আছে, তাকে রক্ষা করা কি আপনার পক্ষে সম্ভব? এরকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস।

এখানে 'হাক্কা আ'লাইহি কালিমাতুল আ'জাব' অর্থ যার উপর দণ্ডাদেশ অবধারিত হয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির উদ্দেশ্য আবু লাহাব ও তার পুত্র। এখানকার 'তুমি কি রক্ষা করতে পারবে' কথাটি সম্পর্কযুক্ত আর একটি অনুক্ত শর্তের সঙ্গে। ওই অনুক্ততা সহ পুরো বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তুমি কি তার কর্মের প্রভু এবং এমন ক্ষমতাশালী যে, যার জন্য দোজখের দণ্ডাদেশ অনিবার্য হয়েছে, তাকে রক্ষা করতে পারবে?— এমতো প্রশ্নের জবাব হতে পারে একটাই— না, কখ্খনো নয়। সুতরাং প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক।

এখানে 'ইউনক্বিজু' হচ্ছে প্রশ্নের পুনরুক্তি, যা অবাস্তবতার পক্ষে দৃঢ়তাসূচক। আর 'ইউনক্বিজুহুম' এর পরিবর্তে 'তুনক্বিজু মান ফীন্নার' কথাটি এই অস্বীকৃতিকে করেছে অধিকতর সুদৃঢ়। আর 'হাক্ক্ব'(অবধারিত) শব্দটি এখানে এই ইঙ্গিত প্রদান করে যে, যার জন্য শাস্তি অনিবার্য, সে যেনো শাস্তির মধ্যেই আছে। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালার সিদ্ধান্তের অন্যথা হওয়া অসম্ভব।

সূরা আনাম , আয়াত ১০৭ , ব্যাখ্যায় তাফসীরে ইবনে আববাস ১ম খন্ড

১০৭. মহান আল্লাহ্ চাইলে তারা শির্ক করতো না। আমি তোমাকে তাদের রক্ষক বানাই নি এবং তুমি তাদের কর্মবিধায়ক নও।

৩৯২ তাফসীরে ইব্‌ন আব্বাস

(وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ مَا أَشْرَكُوْا) আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন, যে তারা শিরক করবে না, তবে তারা শিরক করত না (وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا) এবং আমি আপনাকে তাদের জন্য রক্ষক নিযুক্ত করিনি, যে আপনি তাদেরকে রক্ষা করবেন (وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ) আর আপনি তাদের অভিভাবকও নন।

এর মানে দাড়ায় , পৃথিবীতে মানুষ যে শিরক করে তা আল্লার ইচ্ছানুযায়ীই করে। ইসলামি বিশ্বাসমতে আল্লার ইচ্ছার বাইরে যাওয়া তো কোন কিছুর পক্ষেই সম্ভব নয়। শিরকের মত মহাপাপ আল্লার ইচ্ছাতেই হয় এবং বান্দা তার সাজা পায় , কি উদ্ভট পরিকল্পনা ! আরো উদ্ভট বৈপরিত্য বা অসঙ্গতি চলে আসে যখন সুরা লুকমানের ১৩ নং আয়াতে বলা হয় – 'শিরক সবচেয়ে বড় জুলুম' । এ দুটি আয়াতের বক্তব্যে স্পষ্ট অসঙ্গতি বিদ্যমান। আল্লার ইচ্ছাতেই শিরক হয় এবং সেই শিরকই না কি বড় জুলুম !

অসঙ্গতি সম্পর্কে কোরানে বলা হচ্ছে – 'কোরান আল্লা ব্যতিত অন্য কারো পক্ষ থেকে আসলে এতে অনেক অসঙ্গতি থাকত' । আমরা তো বড় রকমেরই অসঙ্গতি পেলাম ! এখন ভাবনা পাঠকের !!

সূরা বাকারা , আয়াত ২৪৩

২৪৩. আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা মৃত্যুভয়ে হাজারে হাজারে স্বীয় আবাসভূমি পরিত্যাগ করেছিল[১]?	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ
অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে বলেছিলেন, 'তোমরা মরে যাও'। তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে জীবিত করেছিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না[১]।	اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾

ব্যাখ্যায় - তাফসীরে যাকারিয়া

(১) এ আয়াত কয়েকটি বিষয়ের সমাধান করে দিয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ্‌র নির্ধারিত তাকদীরের উপর কোন তদবীর কার্যকর হতে পারে না। জিহাদ বা মহামারীর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচানো যায় না, আর মহামারীগ্রস্ত স্থানে অবস্থান করাও মৃত্যুর কারণ হতে পারে না। মৃত্যুর একটি সুনির্দিষ্ট সময় রয়েছে, যার কোন ব্যতিক্রম হওয়ার নয়।

ব্যক্তির মনে এমন ধারণা হতে পারে যে, সেখানে না গেলে হয়ত সে মারা যেত না। তাছাড়া অন্যান্য লোকেরও হয়ত এ ধারণাই হবে যে, এখানে না এলে মৃত্যু হত না। অথচ যা ঘটেছে তা পূর্বেই নির্ধারিত ছিল। যেখানেই থাকত, তার মৃত্যু এ সময়েই হত। এ আদেশের মাধ্যমে মুসলিমদেরকে ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় থেকে রক্ষা করা হয়েছে। যাতে করে তারা কোন ভুল বোঝাবুঝির শিকার না হয়।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্লেগ মহামারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন, 'এ রোগটি আসলে শাস্তিরূপে নাযিল হয়েছিল এবং যে জাতিকে শাস্তি দেয়া উদ্দেশ্য হত তাদের ভেতর পাঠানো হত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা একে মুমিনদের জন্য রহমতে পরিবর্তিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র যেসব বান্দা এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়া সত্ত্বেও নিজ এলাকায়ই ধৈর্য সহকারে বসবাস করে এবং এ বিশ্বাস রাখে যে, তার শুধু সে বিপদই হতে পারে, যা আল্লাহ্

তা'আলা তার জন্য লিখে রেখেছেন, তবে এমন ব্যক্তি শহীদের মত সওয়াব পাবে'। [বুখারীঃ ৫৭৩৪] রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীঃ 'প্লেগ শাহাদাত এবং প্লেগ আক্রান্ত ব্যক্তি শহীদ'। [বুখারীঃ ৫৭৩২] এর ব্যাখ্যাও তাই। [মা'আরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত]

উক্ত আয়াত ও তার ব্যাখ্যা থেকে জানতে পারলাম –

১. নির্ধারিত তাকদীরের উপর তদবীর চলে না।

২. যুদ্ধ বা মহামারীর ভয়ে পালিয়ে প্রাণ বাচানো যায় না , কারণ তা তাকদীরে পূর্ব নির্ধারিত। ইসরাইল-ফিলিস্তিন যুদ্ধে যে মুসলিমরা মরছে এটাও তাহলে নারী , শিশু , বৃদ্ধ ফিলিস্তিনীদের তাকদীরের লেখা ! অহেতুক আমরা ইস্রাইলিদের দোষ দেই , তারাও তো তাকদীরানুযায়ীই মুসলিমদের মারছে।

৩. কোন জাতীকে শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে আল্লা প্লেগ রোগ দেয় , যা পূর্ব থেকেই তাদের তাকদীরে লেখা থাকে। সূরা ইসরাইলের ১৬ নং আয়াতে দেখেছি আল্লা কাউকে সাজা দিতে চাইলে আগে তাদের অসৎ কাজ করান এবং পরে দোষী বানায় , অবশেষে সাজা দেন ! আর এ সকল কিছুই পূর্ব থেকেই নির্ধারিত থাকে তাকদীরে।

সূরা আল আরাফ , আয়াত ৩০

৩০. একদলকে তিনি হিদায়াত করেছেন। আর অপরদল, তাদের উপর পথ ভ্রান্তি নির্ধারিত হয়েছে[১]। নিশ্চয় তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে শয়তানকে তাদের অভিভাবক-রূপে গ্রহণ করেছিল এবং মনে করত[২] তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।

فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَٰلَةُ ۗ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَٰطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ۝

এই আয়াতে 'ভ্রান্তি নির্ধারিত হওয়া' আর 'শয়তানকে অভিভাবক বানানো' দুটি ঘটনা। কেউ শয়তানকে অভিভাবক বানাতে চাইলে তার তো পৃথিবীতে জন্ম নেয়া প্রথম শর্ত মানে আগে পৃথিবীতে আসতে হবে। অপরপক্ষে, আল্লা ভ্রান্তি নির্ধারণ

করেন তাকদীরে যা আসমান-জমিন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর আগেই সম্পন্ন হয়ে যায়। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম , আল্লার নির্ধারিত বিধানানুযায়ীই বান্দা শয়তানকে অভিভাবক বানায় দুনিয়াতে এসে। অর্থাৎ , আল্লার ইচ্ছাতেই মানুষ কাফের হয়।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে যাকারিয়ায় লিখেছে –

এ আয়াতের সমর্থনে আরও আয়াত ও অনেক হাদীস এসেছে। সূরা আত-তাগাবুনের ২নং আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা এ কথাটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এটা তাক্‌দীরের সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত মানুষকে কাফের ও মুমিন এ দু'ভাগে ভাগ করেছেন। কিন্তু মানুষ জানেনা সে কোনভাগে। সুতরাং তার দায়িত্ব হবে কাজ করে যাওয়া। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন হাদীসেও তা বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'তোমাদের কেউ কেউ এমন কাজ করে যে, বাহ্য দৃষ্টিতে সে জান্নাতের অধিবাসী অথচ সে জাহান্নামী। আবার তোমাদের কেউ কেউ এমন কাজ করে যে, বাহ্য দৃষ্টিতে মনে হয় সে জাহান্নামী অথচ সে জান্নাতী। কারণ মানুষের সর্বশেষ কাজের উপরই তার হিসাব নিকাশ'। [বুখারীঃ২৮৯৮, ৪২০২, মুসলিমঃ ১১২, আহমাদ ৫/৩৩৫] অন্য হাদীসে এসেছে, 'প্রত্যেক বান্দাহ পুনরুত্থিত হবে সেটার উপর যার উপর তার মৃত্যু হয়েছে'। [মুসলিমঃ২৮৭৮]

সূরা আল আরাফ , আয়াত ১৪৫ , ব্যাখ্যায় – তাফসীরে যাকারিয়াঃ

১৪৫. আর আমরা তার জন্য ফলকসমূহে[১] সর্ববিষয়ে উপদেশ ও সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখে[২] দিয়েছি; সুতরাং

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আদম এবং (মূসা 'আলাইহিমাস্ সালাম) তর্ক করলেন। মূসা বললেন, আপনিই তো আমাদের পিতা, আশা-ভরসা সব শেষ করে দিয়ে আমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে নিয়ে আসলেন। আদম বললেন, হে মূসা, আল্লাহ্ আপনাকে তাঁর সাথে কথা বলার জন্য পছন্দ করেছেন, স্বহস্তে আপনার জন্য লিখে দিয়েছেন। আপনি আমাকে এমন বিষয়ে কেন তিরস্কার করছেন, যা আল্লাহ্ আমাকে সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বেই আমার তাকদীরে লিখেছেন। এভাবে আদম মূসার উপর তর্কে জিতে গেলেন। তিনবার বলেছেন। [বুখারীঃ ৬৬১৪] এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা নিজ হাতে তাওরাত লিখেছেন এবং আদম 'আলাইহিস্ সালামের জান্নাত থেকে বের হওয়াটা যেহেতু বিপদ ছিল সেহেতু তিনি তাকদীরের দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। মূলতঃ তাকদীরের দ্বারা দলীল গ্রহণ শুধুমাত্র বিপদের সময়ই জায়েয। গোনাহর কাজের মধ্যে জায়েয নাই। [মাজমু ফাতাওয়া ৮/১০৭; দারয়ূ তা'আরুযুল আকলি ওয়ান নাকলি: ৪/৩০৩]

উক্ত আয়াতে মুসার কিতাব তাওরাত যা আদমের সৃষ্টির ৪০ বছর আগে লেখা তাতে সব স্পষ্ট করেই আল্লা লিখেছিল যে আদম নাফরমানি করবে। যা তাকদীরের দলিল। এখানে আরেকটা বিষয় দেখার মত , আল্লা নিজ হাতে তাওরাত লিখেছিল অথচ কোরানের দুটি সূরা থেকে (২:৭৫ , ৪:৪৬) আমরা জানতে পারি মানুষে সেই আল্লার নিজ হাতে লেখা গ্রন্থও বিকৃত করে ফেলেছে। আল্লা নিজের লেখা গ্রন্থ রক্ষা করতেও ব্যর্থ! এরপর আমরা দেখলাম বিপদের সময় তাকদির দিয়ে দলিল দেয়া যায়েজ কিন্তু গোনাহের কাজে তাকদীরের দলিল দেয়া জায়েজ নাই । বিপদ আল্লার সৃষ্টি, গোনাহের কাজ কি আল্লার সৃষ্টি না? ইতিমধ্যেই আমরা দেখেছি বান্দার সকল কর্মের স্রষ্টা আল্লা, মানুষ শুধু সেই কর্ম নির্মান বা বাস্তবায়ন করে (সূরা সাফফাতের ৯৬ এবং সূরা কাহাফের ২৮ নং আয়াত দ্রষ্টব্য) ।

সূরা ইউনুস , আয়াত ৯৯

৯৯. আর আপনার রব ইচ্ছে করলে যমীনে যারা আছে তারা সবাই ঈমান আনত[১]; তবে কি আপনি মুমিন হওয়ার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করবেন[২]?

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ۗ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٩﴾

ব্যাখ্যায় – তাফসীরে যাকারিয়া , পৃঃ ১১০৫

ইবন আব্বাস বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল যে, সমস্ত মানুষই ঈমান আনুক। তখন আল্লাহ্ তা'আলা জানিয়ে দিলেন যে, যাদের ঈমানের কথা পূর্বেই প্রথম যিকর তথা মানুষের তাকদীরে লিখা হয়েছে কেবল তারাই ঈমান আনবে, আর যাদের দূর্ভাগ্যের কথা প্রথম যিকর তথা প্রথম তাকদীর নির্ধারণে লিখা হয়েছে কেবল তারাই দূর্ভাগা হবে। [তাবারী; কুরতুবী]

আরেকটি ব্যাখ্যা – তাফসীরে মাযহারি , ৫ম খন্ড , পৃঃ ৬৫৬-৫৭

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনার প্রভুপ্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীবাসী সকলেই ইমান আনতো। কারণ তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবার ক্ষমতা কারো নেই। কিন্তু তিনি কাউকে ইমান গ্রহণে বাধ্য করেন না। তবে আপনি এ ব্যাপারে মানুষের উপরে জবরদস্তি করবেন কেনো?

বাতিল ফেরকার লোকেরা বলে, আল্লাহ্তায়ালা চান সকলেই ইমানদার হোক। কিন্তু অবিশ্বাসীরা ইমান আনতে চায় না। তারা ইচ্ছা ও অনুমোদনের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। তারা বলে ইচ্ছা অর্থ পছন্দ। সত্যপন্থী আশায়েরা সম্প্রদায়ের অভিমত হচ্ছে, সকলে ইমান আনুক আল্লাহ্পাক এটাই পছন্দ করেন, কিন্তু তাঁর

ইচ্ছা এ রকম নয়। তাই মানুষ আল্লাহ্র পছন্দের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে, কিন্তু তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করার সাধ্য কারো নেই। অতএব সন্তোষ ও অভিপ্রায় কখনো এক নয়। পথভ্রষ্ট কাদরিয়া সম্প্রদায় বলে, সন্তোষ ও অভিপ্রায় একই। সন্তোষ ও অভিপ্রায় দু'টোই সাধারণ বিষয়। সুতরাং মানুষ আল্লাহ্র সন্তোষ বিরোধী যা কিছু করে তা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই করে। কিন্তু এই আয়াত তাদের অভিমতের বিরুদ্ধে। এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে— আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সকল মানুষ বিশ্বাস করতো, ইমান গ্রহণ করতে বাধ্য হতো। তবে হ্যাঁ, সকলের ইমান আনা আল্লাহ্র পছন্দ— অর্থাৎ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির অনুকূল কর্ম। —এ কথার প্রেক্ষিতে কাদরিয়ারা আবার বলে, এখানে কেবল আল্লাহ্র ইচ্ছার কথাই বলা হয়েছে, কাউকে বাধ্য করার কথা বলা হয়নি। —এ কথাটিও ঠিক নয়। কারণ, আল্লাহ্র ইচ্ছা বাধ্যতামূলক। যদি তা না হয় তবে আল্লাহ্ যে ইচ্ছাময়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অসীম ইচ্ছাশক্তির অধিকারী, তা প্রমাণ হবে কীভাবে? সৃষ্টি কী কখনো স্রষ্টার ইচ্ছাকে অতিক্রম করতে পারে?

আল্লার ইচ্ছা বাধ্যতামুলক !

সূরা হুদ , আয়াত ১০৫

১০৫. যখন সেদিন আসবে তখন আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না[২]; অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ হবে হতভাগ্য আর কেউ হবে সৌভাগ্যবান[৩]।

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۝

ব্যাখ্যায় – তাফসিরে যাকারিয়া , পৃঃ ১১৭৫

উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ যখন এ আয়াত "তাদের মধ্যে কেউ হবে হতভাগ্য আর কেউ হবে ভাগ্যবান" নাযিল হলো তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর নবী! তা হলে কি জন্য আমল করব? যে ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে গেছে সেটার জন্য আমল করব নাকি চূড়ান্ত ফয়সালা হয়নি এমন বস্তুর জন্য আমল করব? তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "হে উমর! বরং যে ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে এবং কলম দিয়ে লিখা হয়ে গেছে এমন বিষয়ের জন্য আমল করবে। তবে যাকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য সেটাকে সহজ করে দেয়া হবে।" [তিরমিযীঃ৩১১১] অর্থাৎ তাকদীরের খবর আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। যদি সে ঈমানদার হিসেবে লিখা হয়ে থাকে তবে তার জন্য সৎকাজ করা সহজ করে দেয়া হবে। আর যদি বদকার ও কাফের হিসেবে লেখা হয়ে থাকে তবে সে ভাল কাজ করতে চাইবে না, ভাল কাজ করা তার দ্বারা সহজ হবে না। তাই প্রত্যেকের উচিত ভাল কাজ করতে সচেষ্ট হওয়া। কারণ ভাল কাজের প্রতি প্রচেষ্টাই তার ভাগ্য ভাল কি মন্দ হয়েছে তার প্রতি প্রমাণবহ। তা না

করে নিছক তাকদীরের উপর নির্ভর করে বসে থাকলে বুঝতে হবে যে, সে অবশ্যই হতভাগা, তার তাকদীরে ভালো লিখা হয়নি। যা অধিকাংশ দুর্ভাগা মানুষ সবসময় করে থাকে। তারা ভাগ্যকে অযথা টেনে এনে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে এবং ভাগ্য নিয়ে অযথা বাদানুবাদ করে। অপরপক্ষে, যাদের ভাগ্য ভাল, তারা তাকদীরের উপর ঈমান রাখে কিন্তু সেটাকে টেনে এনে হাত-পা গুটিয়ে বসে না থেকে ভাল কাজ করতে সদা সচেষ্ট থাকে। তারপর যদি ভাল কিছু পায় তবে বুঝতে হবে যে, প্রচেষ্টা করার কথাও তার তাকদীরে লিখা আছে। আর যারা সৎ কাজের চেষ্টা না করে অযথা তাকদীর নিয়ে বাড়াবাড়ি করে তাদের সম্পর্কে বুঝতে হবে যে, তারা সৎকাজের প্রচেষ্টা করবে না এটাই লিখা হয়েছিল সে জন্য তারা দুর্ভাগা। তাকদীর সম্পর্কে এটাই হচ্ছে মূল কথা। [দেখুন, শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন: আল-কাওলুল মুফীদ আলা কিতাবিত তাওহীদ ২/৪১৩-৪১৪]

আমরা এখান থেকে জানলাম , যাকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লা তার জন্য সেটাকেই সহজ করে দিবেন। আর তাকদীরে যাকে বদকার বা কাফের হিসেবে লেখা হয়েছে সে ভাল কাজ করতে চাইবে না। কেউ যদি চেষ্টা করে ভাল কাজ করে বুঝতে হবে তার চেষ্টা করার কথাটাও তাকদীরে লেখা ছিল। আর কেউ তাকদীর নিয়ে

বাড়াবাড়ি করলে এই বাড়াবাড়িটাও তার তাকদীর অনুযায়ই করবে। পাঠক , আপনি যে এই লেখাটি পড়ছেন সে হিসেবে আপনিও আপনার তাকদীর অনুযায়ই পড়ছেন !

সূরা আর রাদ , আয়াত ১১

১১. মানুষের জন্যে তার সামনে ও পেছনে একের পর এক প্রহরী থাকে; ওরা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে, নিশ্চয় আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে, কোন সম্প্রদায়ের সম্পর্কে যদি আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তবে তা রদ করবার কেউ নেই এবং তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক নেই।

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهٖ يَحۡفَظُوۡنَهٗ مِنۡ اَمۡرِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوۡا مَا بِاَنۡفُسِهِمۡ ؕ وَاِذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوۡمٍ سُوۡٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمۡ مِّنۡ دُوۡنِهٖ مِنۡ وَّالٍ ⑪

এই বাক্যে দুটি বিপরীত বক্তব্য দৃশ্যমান , কোন সম্প্রদায় তাদের অবস্থা নিজেরাই পরিবর্তন করে এবং আল্লা কোন সম্প্রদায়ের খারাপ করতে চাইলে তা কেউ ঠেকাতে পারে না। এখানে প্রশ্নটা হল , আল্লা কারো অশুভ ইচ্ছা করলে বান্দারা কিভাবে নিজেদের অবস্থার নিজেরা পরিবর্তন করবে ? আল্লার ইচ্ছাতো বাধ্যতামূলক , কেউ আল্লার ইচ্ছাকে অতিক্রম করতে পারে না। সুষম সমস্যা !!

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা – তাফসিরে যাকারিয়া , পৃঃ ১২৭২

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে আয়াতের আরেকটি অর্থ বর্ণিত আছে, তা হচ্ছে, আল্লাহ্র নির্দেশ থেকে তাকে হেফাযত করে ।[ইবন কাসীর] অর্থাৎ তাঁর কোন প্রকার আযাব যেমন, জিন ইত্যাদি থেকে তাদেরকে হেফাযত করে । [কুরতুবী] তারপর যখন তার তাকদীর অনুসারে কোন কিছু ঘটার জন্য আল্লাহ্র নির্দেশ আসে তখন ফিরিশ্‌তাগণ সরে পড়ে । আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ 'প্রত্যেক মানুষের সাথে কিছুসংখ্যক হেফাযতকারী ফিরিশ্‌তা নিযুক্ত রয়েছেন । তার উপর যাতে কোন প্রাচীর ধ্বসে না পড়ে কিংবা সে কোন গর্তে পতিত না হয়, কিংবা কোন জন্তু অথবা মানুষ তাকে কষ্ট না দেয়, ইত্যাদি বিষয়ে ফিরিশ্‌তাগণ তার হেফাযত করেন । ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ তবে কোন মানুষের তাকদীর লিখিত বিপদাপদে জড়িত হওয়ার সময় ফিরিশ্‌তারা সেখান থেকে সরে যায় ।' [ইবনে হাজারঃ ফাতহুল বারী ৮/৩৭২]

এই ব্যাখ্যা থেকে দেখলাম , প্রত্যেক মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লা তাদের সাথে ফেরেস্তা নিযুক্ত করেন অথচ তাকদীরে লেখা বিপদ আসলে ফেরেস্তারা চলে যায় । টোটালি ননসেন্স টক ! সব তো তাকদীর অনুসারেই হয় (হাদিস, পৃঃ ৭) আর তাকদীরেই লেখা থাকে মানুষের বিপদ-আপদ (হাদিদ ২২) । বিপদ যদি তাকদীর অনুসারেই হয় আর তাকদীরের বিপদ দেখলে যদি ফেরেস্তা পালিয়েই যায় তাহলে 'বাংলাদেশের ঈদের চাঁদ দেখা কমিটি'র মত এমন নিষ্কর্মা ফেরেস্তা বাহিনী নিযুক্ত করার দরকারটা কি ?

উক্ত আয়াতের আরেকটি ব্যাখ্যা – তাফসিরে মাযহারি , ৬ষ্ঠ খন্ড , পৃঃ ৩০১

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে। কোনো সম্প্রদায় সম্পর্কে যদি আল্লাহ্ অশুভ কোনো কিছু ইচ্ছা করেন, তবে তা রদ করবার কেউ নেই এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোনো অভিভাবক নেই।' একথার অর্থ— কোনো জাতিই সুদিনের মুখ দেখতে পায় না, যতক্ষণ না তারা সুদিন ফিরে পাওয়ার জন্য দুর্দিনে চেষ্টা সাধন না করে। আর কোনো জাতির প্রতি যদি আল্লাহ্ অশুভ কিছু আপতিত করতে চান, তবে তা প্রতিরোধ করার সাধ্যও কারো নেই এবং তিনি ছাড়া তাদের কোনো অভিভাবকও নেই। হওয়া সম্ভবও নয়।

এখানে 'মা বিক্বওমিন্' অর্থ জাতির সুদিন বা শুভদিন। 'মা বিআনফুসিহিম' অর্থ তারা কল্যাণ কামনা না করে কামনা করে অকল্যাণের (অকল্যাণকে পরিবর্তনের চেষ্টা না করে)।

'ইজা আরাদাল্লহু বিক্বওমিন্' অর্থ চেষ্টা সাধনার পরেও যদি আল্লাহ্ তাদের প্রতি অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন, শাস্তি প্রদান করতে চান। 'ফালা মারাদ্দা লাহু' অর্থ তবে তা প্রতিরোধ করবার কেউ নেই। 'মারাদ্দুন' শব্দটি ধাতুমূল, তবে কর্তৃকারকের অর্থ প্রকাশক। 'মিঁউওয়াল' অর্থ বিপদ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা। আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্পাকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কিছু সংঘটিত হয় না। হতে পারে না। এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত। কিন্তু পথভ্রষ্ট মুতাজিলারা বলে এরকম হওয়া সম্ভব।

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ্ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমার প্রিয়তম রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে কেউ যেনো তার সর্বনাশ ডেকে না আনে। আমার কোপ ও শাস্তি প্রতিরোধ করার সাধ্য কারো নেই।

এখানে বলা হচ্ছে সুদিন পাওয়ার জন্য চেষ্টা করার কথা অথচ কেউ চেষ্টা করতে পারবে কি না সেটাও তাকদীরেই লেখা থাকে (সূরা হুদের ১০৫ নং আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য) । আর বলা হচ্ছে , আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত আল্লাপাকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছুই সংঘটিত হতে পারে না , কিন্তু আল্লার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কিছু হতে পারে এমন কথা বলে পথভ্রষ্ট মুতাজিলারা ।

সূরা আর রাদ , আয়াত ৩৮

৩৮. আর অবশ্যই আমরা আপনার আগে অনেক রাসূল পাঠিয়েছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম[২] । আর আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নয়[৩] । প্রত্যেক বিষয়ের ব্যাপারেই নির্ধারিত সময় লিপিবদ্ধ আছে[১] ।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা – তাফসিরে যাকারিয়া , পৃঃ ১৩০২

আয়াতের অর্থ বর্ণনায় প্রসিদ্ধ মত এই যে, এখানে তাকদীরের কথাই আলোচনা হচ্ছে। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর মেয়াদ ও পরিমাণ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে লিখিত আছে। তিনি সৃষ্টির সূচনালগ্নে লিখে দিয়েছেন যে, অমুক ব্যক্তি অমুক সময়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং এতদিন জীবিত থাকবে। কোথায় কোথায় যাবে, কি কি কাজ করবে এবং কখন ও কোথায় তার মৃত্যু হবে, তাও লিখিত আছে। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ "আপনি কি জানেন না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ্ তা জানেন। এ সবই আছে এক কিতাবে; নিশ্চয়ই এটা আল্লাহ্‌র জন্য সহজ।" [সূরা আল-হাজ্জঃ ৭০] [বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর]

কে কি কি কাজ করবে এটাও যদি তাকদীরেই লেখা থাকে তাহলে মানুষের ইচ্ছা স্বাধীন কাজ করাটা হল কোথায় ? আর মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতাই বা রইল কোথায়? 'তাকদীর' নামক বিধানটাই প্রমাণ করে ইসলামে মানুষের ইচ্ছা শক্তি নাই ! আর তাকদীরের ব্যাপারে যে কোন কিছুই পরিবর্তন হওয়ার না , তা আমরা দেখতে পাই

সূরা আর রাদের ৩৯ নং আয়াত থেকে –

৩৯. আল্লাহ্ যা ইচ্ছে তা মিটিয়ে দেন এবং যা ইচ্ছে তা প্রতিষ্ঠিত রাখেন[১] এবং তাঁরই কাছে আছে উম্মুল কিতাব[২] । | يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِنْدَهٗۤ اُمُّ الْكِتٰبِ ۝

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা – তাফসিরে যাকারিয়া , পৃঃ ১৩০৩

(২) এখানে ﴿اُمُّ الْكِتٰبِ﴾ এর শাব্দিক অর্থ মূলগ্রন্থ । এর দ্বারা লওহে-মাহ্ফুয বুঝানো হয়েছে, যাতে কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন হতে পারে না । চাই সেটা শরী'আত সম্পর্কিত হোক অথবা তাকদীর সম্পর্কিত হোক । অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তার শরী'আতের মধ্য থেকে যা ইচ্ছা তা রহিত করেন । আর যা ইচ্ছে তা নাযিল করেন । কিন্তু মূলটি উম্মুল কিতাব তথা লাওহে মাহফূযে আছে । সেখানে কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন নেই । অনরূপভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির তাকদীর সম্পর্কে লাওহে মাহফূজে যা লিখা আছে তাতে কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন নেই । [ইবন কাসীর]

এতক্ষণ আমরা কোরান হাদিস তাফসির থেকে দেখেছি , এবার শুধু হাদিস থেকে তাকদীর সম্পর্কিত কিছু হাদিস দেখবঃ

মিশকাতুল মাসাবির সবগুলো হাদিস ১ম খন্ড থেকে নেয়া ।

মিশকাতুল মাসাবিহ , আধুনিক প্রকাশনি (২০১২) , হাদিসের মানঃ সহিহ

৭৮ । হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, একজন আনসারীর বাচ্চার জানাযার নামায পড়াবার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডাকা হলো । (এ সময়) আমি (আয়েশা) বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এই বাচ্চার কি খোশনসীব । সে তো জান্নাতের চড়ুই পাখীদের মধ্যকার একটি চড়ুই পাখী । সে তো কোন খারাপ কাজ করেনি । আর না সে কোন খারাপ কাজ করার সীমায় পৌঁছেছে । (এ কথা শুনে) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এছাড়া অন্য কিছু কি হতে পারে না হে আয়েশা? আল্লাহ তাআলা জান্নাতের জন্য একদল লোককে সৃষ্টি করেছেন, যখন তারা তাদের পিতার পৃষ্ঠদেশে ছিলো, আবার দোজখের জন্যও একদল লোক সৃষ্টি করেছেন, যখন তারা তাদের পিতার পৃষ্ঠদেশে ছিলো (মুসলিম) ।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, জান্নাত ও জাহান্নামে যাবার জন্য নেক বা বদ আমল কোন কারণ হবে না, বরং তা তাকদীরের উপর নির্ভর করবে। আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য রোজে আযল থেকে জান্নাত লিখে রেখেছেন, চাই তারা নেক আমল করে থাকুক বা না থাকুক। ঠিক এইভাবে আর এক জনগোষ্ঠীকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তারা নিশ্চিত দোযখে যাবে। তাদের আমল বদ হোক বা না হোক। তাই হাদীসে উল্লেখিত এই ছেলে যদি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে সে নিশ্চয়ই জাহান্নামে যাবে। যদিও এখনো তার বদ আমল করার বয়স হয়নি। তবে আল্লাহ নিরপরাধীকে শাস্তি দেন না।

মিশকাতুল মাসাবিহ , হাদিস একাডেমি (২০১৩)

৯৪। 'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহ সর্বপ্রথম যে বস্তুটি সৃষ্টি করেছিলেন তা হচ্ছে কলম। অতঃপর তিনি ক্বলমকে বললেন, লিখ। কলম বলল, কী লিখব? আল্লাহ বললেন, ক্বদ্‌র (তাক্বদীর) সম্পর্কে লিখ। সুতরাং কলম– যা ছিল ও ভবিষ্যতে যা হবে, সবকিছুই লিখে ফেলল। তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদীসটি সানাদ হিসেবে গরীব।[১১৩]

---

[১১২] সহীহ : বুখারী ১৩৮৪, মুসলিম ২৬৫৯।

[১১৩] সহীহ : আত্ তিরমিযী ২০৮১, সহীহুল জামি' ২০১৭, আহ্‌মাদ ৫/৩১৭। এটি ইমাম আত্ তিরমিযী (রহঃ)-এর উক্তির অর্থ সরাসরি উক্তি নয়। আর তিনি "ক্বদ্‌র" অধ্যায়ের ২০/২৩ নং হাদীসে এর হুকুম সম্পর্কে বলেছেন : حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا

মিশকাতুল মাসাবিহ , আধুনিক প্রকাশনি (২০১২) , হাদিসের মানঃ হাসান

৯০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুই হাতে দুইটি কিতাব নিয়ে বেরিয়ে এলেন। সাহাবাদের উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, তোমরা কি জানো এই কিতাবদ্বয় কিসের?

আমরা বললাম, না, হে আল্লাহর রাসূল! তবে আপনি আমাদের অবহিত করুন। তিনি তাঁর ডান হাতের কিতাবটি সম্পর্কে বলেন, আমার ডান হাতে যে কিতাবটি আছে এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি কিতাব। এই কিতাবে সকল জান্নাতী মানুষের নাম, তাদের পিতার নাম ও বংশ-গোত্রের নাম রয়েছে। তারপর এদের সর্বশেষ ব্যক্তির নাম লিখে মোট যোগ করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং এতে আর কখনো (কোন নাম) বাড়ানোও যাবে না কমানোও যাবে না। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাঁ হাতের কিতাব সম্পর্কে বললেন, এটাও আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে একটি কিতাব। এই কিতাবে সকল জাহান্নামীর নাম আছে। এতে তাদের বাপ-দাদাদের নাম আছে তাদের বংশ-গোত্রের নামও আছে। এরপর তাদের সর্বশেষ ব্যক্তির নাম লিখে মোট যোগ করে দেয়া হয়েছে। তাই এতে (আর কোন নাম কখনো) বাড়ানোও যাবে না কমানোও যাবে না। এই বর্ণনা শুনার পর সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আগ থেকেই এইসব ব্যাপার নির্দিষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে (যে, জান্নাত ও জাহান্নামের ব্যাপারটি) বিধিলিপির (তাকদীর) উপর নির্ভরশীল, তাহলে আর আমল করার প্রয়োজন কি? জবাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (দীন-শরীয়ত অনুযায়ী নিজেদের আমল আখলাক) ভালোভাবে মজবুত করো। আল্লাহর নৈকট্য লাভ করো। কারণ জান্নাতবাসীদের পরিসমাপ্তি জান্নাত পাবার মতো আমলের দ্বারা শেষ হবে। দুনিয়ার (জীবনে চাই সে) যা-ই করুক। আর জাহান্নামবাসীদের পরিসমাপ্তি জাহান্নামে যাবার মতো আমলের দ্বারা শেষ হবে। তার (জীবনের) আমল যা-ই হোক। তারপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুই হাতে ইশারা করলেন এবং কিতাব দু'টিকে পেছনের দিকে ফেলে দিয়ে বললেন, তোমাদের রব বান্দাদের ব্যাপারে আগ থেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রেখেছেন। একদল জান্নাতী, আর একদল জাহান্নামী (তিরমিযী)।

মিশকাতুল মাসাবিহ , হাদিস একাডেমি (২০১৩) , হাদিসের মানঃ হাসান

৯৮। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা তাক্বদীর সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত ছিলাম। এমন সময় রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নিকট এসে উপস্থিত হন। তিনি এটা দেখে এত রাগ করলেন যে, রাগে তাঁর চেহারা মুবারক লাল হয়ে গেল, মনে হচ্ছিল যেন তাঁর চেহারা মুবারকে আনারের (ডালিমের) রস নিংড়িয়ে দেয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমাদের কি (তর্কে লিপ্ত হওয়া জন্য) নির্দেশ দেয়া হয়েছে অথবা এজন্য কি রসূল বানিয়ে তোমাদের নিকট আমাকে পাঠানো হয়েছে? (জেনে রাখ!) তোমাদের পূর্বে অনেক লোকেরা বিতর্কে লিপ্ত হয়ে তখনই ধ্বংস হয়েছে, যখনই তারা এ বিষয় নিয়ে বাক-বিতণ্ডা করেছে। আমি তোমাদেরকে কসম করে বলছি, আবারও কসম করে বলছি– সাবধান! এ বিষয় নিয়ে তোমরা কক্ষনো তর্কে জড়িয়ে যেয়ো না।[১১৭]

তাকদীর বিষয়টি যে ইসলামের একটি সুষম সমস্যা এটা শুধু আমরা না নবীও তার জীবদ্দশাতেই এর সম্মুখিন হয়েছিল বিধায় লোকদের ধ্বংস হওয়ার ভয় দেখিয়ে মানুষের জিজ্ঞাসু মনের প্রশ্ন আর আলোচনাকে ধামাচাপা দিয়েছিল !

মিশকাতুল মাসাবিহ , হাদিস একাডেমি (২০১৩) , হাদিসের মানঃ সহিহ

১০১। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টজীবকে অন্ধকারে সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি তাদের প্রতি স্বীয় নূর (জ্যোতি) নিক্ষেপ করেন। সুতরাং যার কাছে তাঁর এ নূর পৌঁছেছে, সে সৎপথপ্রাপ্ত হয়েছে। আর যার কাছে

তাঁর এ নূর পৌঁছেনি, সে বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। তাই আমি (সাঃ) বলি : আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুযায়ী যা হওয়ার তা-ই হয়ে ক্বলম শুকিয়ে গেছে।[১২০]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে তাক্বদীরের আলোচনা করা হয়েছে।

(خلقه) দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধুমাত্র মানুষ, জিন্ বা মালাক (ফেরেশতা) নয়। কেননা তাদেরকে কেবল নূর থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

লুম্‌আতের লেখক বলেন, এখানে (خلقه) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জন্মের সময়, আর নিক্ষেপণের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হিদায়াতের তাওফীক প্রদান এবং শরীয়তের বিধি-বিধান প্রকাশ হওয়ার সময়। এক কথায় অত্র হাদীসে প্রমাণ রয়েছে যে, যাকে নূর দেয়া হয়েছে সে ব্যতিত সৃষ্টি করার মুহূর্তে মানুষই অন্ধকারে ছিল।

তবে এ ক্ষেত্রে ফিত্বরাতের যে হাদীস আছে তার সাথে এ হাদীসের বিষয়টি একটু সাংঘার্ষিক মনে হয় যে ফিতরাতের হাদীস প্রমাণ করছে যে, মানুষ জন্মের সময় প্রত্যেকেই ফিত্বরাতের আলোর উপর থাকে আর এ হাদীসে বলা হলো আলো না দেয়ার আগ পর্যন্ত সবাই অন্ধকারেই থাকে।

যার নিকট আলোর কিছু অংশ পৌঁছাল। কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, نور দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হলো ঈমানের আলো। আর কেউ কেউ বলেছেন, نور দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর নিদর্শন থেকে তাকে চিনবার মতো মানবিকতা। অতএব আল্লাহ তা'আলা যাকে হেদায়াত দান করবেন সে আল্লাহ পাকের এই সব নিদর্শন দেখে আল্লাহর অস্তিত্ব বুঝতে পারে আর আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা করেন না সে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে তার নিদর্শন খুজে পায় না। এটাই আল্লাহ তা'আলা অন্যত্রে বলেছেন,

﴿أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْرًا﴾

"যে ছিল মৃত্যু তাকে আমি জীবিত করলাম এবং তাকে আলো (হিদায়াতের আলো) দান করি।"

(সূরাহ্ আল আন্'আম ৬ : ১২২)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ﴾

"আল্লাহ তা'আলা যার সীনাকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করেছেন সে তার রবের আলার উপর আছে।"

(সূরাহ্ আয্ যুমার ৩৯ : ২২)

অতএব, বুঝা গেল হিদায়াত এবং ভ্রষ্টতা সবই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন।

মিশকাতুল মাসাবিহ , আধুনিক প্রকাশনি (২০১২) , হাদিসের মানঃ সহিহ

৯৭। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ কোন বান্দাহ মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত চারটি জিনিসের উপর ঈমান না আনবে ঃ (১) সে সাক্ষী দেবে আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, (২) নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ দীনে হক নিয়ে আমাকে এ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, (৩) মৃত্যু ও মৃত্যুর পরে হাশরের ময়দানে উঠার উপর ঈমান আনা এবং (৪) তাকদীরের উপর ঈমান আনা (তিরমিযী ও ইবনে মাজা)।

মিশকাতুল মাসাবিহ , আধুনিক প্রকাশনি , হাদিসের মানঃ হাসান

৯৯। হযরত ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'আমার উম্মতের মধ্যেও (আল্লাহর ভয়াবহ শাস্তি) যমীন ডেবে দেওয়া ও চেহারা পরিবর্তন করে দেবার মতো ঘটনা ঘটবে। এই শাস্তি হবে তাদের উপর যারা 'তাকদীরকে' অস্বীকার করবে (আবু দাউদ)। ইমাম তিরমিযীও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মিশকাতুল মাসাবিহ , হাদিস একাডেমি (২০১৩) , হাদিসের মানঃ হাসান

১০৭। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : ক্বদারিয়্যাগণ হচ্ছে এ উম্মাতের মাজূসী। অতঃপর তারা যদি অসুস্থ হয়, তাদেরকে দেখতে যাবে না, আর যদি মারা যায়, তবে তাদের জানাযায় উপস্থিত হয়ো না।[১২৬]

ব্যাখ্যা : আল্লাহর নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এর উক্তি "ক্বদরিয়্যারাই এ উম্মাতের অগ্নিপূজক"-এর ব্যাখ্যা :

"এ উম্মাত" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দা'ওয়াত কবূলকারী উম্মাত। নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ক্বদারিয়্যাহ্-কে 'অগ্নিপূজক' বলার কারণ হচ্ছে তাদের কথা হচ্ছে বান্দা তার নিজের কাজের স্রষ্টা নিজেই। তাদের কাজ আল্লাহ তা'আলার তাক্বদীরে এবং তার ইচ্ছায় হয় না। এ কথাটি অগ্নিপূজকদের কথার সদৃশ, কেননা তারা বলে পৃথিবীর প্রভু হচ্ছেন দু'জন।

১. কল্যাণের স্রষ্টা যার নাম ইয়ায্দান তথা আল্লাহ তা'আলা।

২. অকল্যাণের স্রষ্টা যার নাম আহারমান, অর্থাৎ শায়ত্বন।

আরো বলা হয়ে থাকে, অগ্নিপূজকরা বলে থাকে ভাল কাজ হচ্ছে نور তথা আলোর কৃতি, আর খারাপ কাজ হচ্ছে ظلمة তথা অন্ধকারের কৃতি। অতএব তারা দ্বৈতবাদীতে পরিণত হলো এমনিভাবে ক্বদারিয়্যারা তারা বলে ভাল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আর খারাপ আসে অন্যের পক্ষ থেকে।

মিশকাতুল মাসাবিহ , হাদিস একাডেমি , হাদিসের মানঃ সহিহ
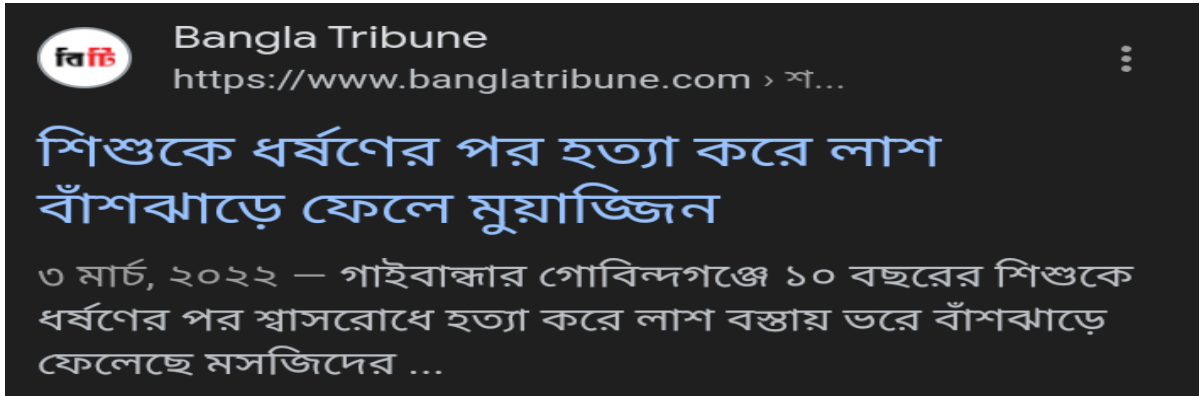
১১০। মাত্বার ইবনু 'উকামিস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর কোন বান্দার নির্ধারিত কোন জায়গায় মৃত্যুর ফায়সালা করেন, তখন সে জায়গায় তার যাওয়ার জন্য একটি প্রয়োজনও তৈরি করে দেন।[১২৯]

ব্যাখ্যা : কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে, ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ "কোন আত্মাই জানে না সে কোথায় মৃত্যুবরণ করবে।" (সূরাহ্ লুক্বমান ৩১ : ৩৪)

উক্ত হাদীসে দলীল পাওয়া যায় তাক্বদীরের।

উক্ত হাদিসের প্রাসঙ্গিক একটা নিউজ দেখে নিই-

Bangla Tribune
https://www.banglatribune.com › শ...

শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা করে লাশ বাঁশঝাড়ে ফেলে মুয়াজ্জিন

৩ মার্চ, ২০২২ — গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে ১০ বছরের শিশুকে ধর্ষণের পর শ্বাসরোধে হত্যা করে লাশ বস্তায় ভরে বাঁশঝাড়ে ফেলেছে মসজিদের ...

উক্ত দূর্ঘটনায় শিশুটি মসজিদে গিয়েছিল আরবি পড়তে। হাদিস অনুযায়ী , ধর্ষণের মাধ্যমে মসজিদে শিশুটির মৃত্যু ফায়সালা করে রেখেছিল আল্লা। মৃত্যুস্থানে যাওয়ার জন্য আল্লা প্রয়োজনও তৈরি করে দেন , এক্ষেত্রে শিশুটির প্রয়োজন ছিল আরবি পড়ার মাধ্যমে আল্লার মনোনীত ধর্মকে জানা ! বিনাপরাধে ধর্ষণের মৃত্যু , এটাই অসীম দয়ালু আল্লাপাকের লেখা তাকদীর ! !

মিশকাতুল মাসাবিহ , আধুনিক প্রকাশনি , হাদিসের মানঃ সহিহ

১০৫। হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিজের মেয়ে সন্তানকে যে নারী জীবিত কবর দেয় এবং যে মেয়েকে কবর দেয়া হয়, উভয়ই জাহান্নামী (আবু দাউদ, তিরমিযী)।

ভিক্টিম বা নির্যাতিতাও জাহান্নামি , মহান ন্যায়বিচারক আল্লাপাকের লেখা তাকদীর বলে কথা ! কোন মুমিন পন্ডিত বলতে পারেন যে পিতা-মাতার পাপে ঐ

কন্যাসন্তানের ওমন সাজা হবে, কিন্তু আল্লা বলে দিয়েছে – 'একজনের পাপের বোঝা অন্য জনের উপর বর্তায় না' (সূরা আনাম , আয়াত ১৬৪) ।

মিশকাতুল মাসাবিহ , হাদিস একাডেমি , হাদিসের মানঃ সহিহ

১১৩। আবুদ্ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা পাঁচটি বিষয়ে তাঁর সৃষ্টজীবের জন্য চূড়ান্তভাবে (তাক্বদীরে) লিখে দিয়ে নির্ধারিত করে রেখেছেন : (১) তার আয়ুষ্কাল (জীবনকাল), (২) তার 'আমাল (কর্ম), (৩) তার অবস্থান বা মৃত্যুস্থান, (৪) তার চলাফেরা (গতিবিধি) এবং (৫) এবং তার রিয্ক্ব (জীবিকা)।[১৩২]

বান্দার আমল বা কর্ম যদি চূড়ান্তভাবে লিখেই দেয় আল্লা তাহলে বান্দার সেই কর্মের দায় কার ? কর্ম চূড়ান্তভাবে লেখা থাকলে ফ্রি উইল থাকে ? বান্দার কর্ম চূড়ান্তভাবে লিখে দেয় আল্লা , সেই কর্ম করার পর যখন আবার আল্লাই বান্দাকে সাজা দেয় আল্লা কি তখন ন্যায় বিচারক থাকেন ?

বুখারী শরীফ (ইফা) , তাকদীর অধ্যায় , হাদিসের মানঃ সহিহ

৬১৪৪ আদম (র) ...... ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! জাহান্নামীদের থেকে জান্নাতীদেরকে চেনা যাবে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। সে বলল, তাহলে আমলকারীরা আমল করবে কেন? তিনি বললেন ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ আমলই করে যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অথবা যা তার জন্য সহজ করা হয়েছে।

বুখারী শরীফ (ইফা) , তাকদীর অধ্যায় , হাদিসের মানঃ সহিহ

৬১৪৯ মালিক ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী (সাঃ)-এর নিকটে ছিলাম। তাঁর সঙ্গে সা'দ ইব্‌ন উবাদা, উবাই ইব্‌ন কাব ও মু'আয ইব্‌ন জাবালও ছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) -এর কোন এক কন্যা কর্তৃক প্রেরিত একজন লোক এই খবর নিয়ে এলো যে, তাঁর পুত্র সন্তান মরণাপন্ন। তখন তিনি এই বলে লোকটিকে পাঠিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ্‌র জন্যই—যা তিনি গ্রহণ করেন। আল্লাহ্‌র জন্যই— যা তিনি দান করেন। প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত একটি সময় রয়েছে। সুতরাং সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং এটাকে যেন সে (সন্তান হারানকে) পুণ্য মনে করে।

এই হাদিস থেকে অবাক করা তাকদীর বিশ্বাসী এক নবীর দেখা পেলাম যে নিজ পুত্রের মৃত্যু সংবাদেও তাকদীরে লেখা আছে বলে ধৈর্য ধারণকরে নিষ্ক্রয় । এমন নির্বোধ কি কেউ আছে যে তার সন্তান হারানোকে পুণ্য মনে করবে ? একটা কুকুরও

তো তার সন্তানের জন্য এই নবীর চেয়ে বেশি যত্নবান ! সাধারণ কোন মানুষ এমন সংবাদে কি করতো ? কি করা উচিত ? এই তাকদীর বিশ্বাস মানুষকে কতটা অন্ধ বানাতে চায় , এই হাদিস তার নজির ।

বুখারী শরীফ (ইফা) , তাকদীর অধ্যায় , হাদিসের মানঃ সহিহ

৬১৫০ হিব্বান ইব্‌ন মূসা (র) ...... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (একদা) নবী ﷺ -এর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় আনসার গোত্রের একটি লোক এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা তো বাঁদীদের সাথে মিলিত হই অথচ মালকে মুহাব্বত করি। সুতরাং 'আযল' করা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা কি এ কাজ কর? তোমাদের জন্য এটা করা আর না করা উভয়ই সমান। কেননা, যে কোন জীবন যা পয়দা হওয়াকে আল্লাহ্ তা'আলা লিখে দিয়েছেন তা পয়দা হবেই।

এই হাদিসে বলছে , যে জীবন পয়দা হওয়ার তা হবেই জন্মনিরোধ ব্যবস্থা নিয়ে কোন লাভ নেই । 'আযল' মানে সঙ্গমের সময় বীর্য বাইরে ফেলা । এখানে জন্ম নিরোধ ব্যবস্থাকে ইসলাম নিরোৎসাহিত করছে তাকদীরের লেখা বলে যা মোটেই সভ্য বা যৌক্তিক কোন কথা নয়। আমরা আরো জানলাম , নবীর সাহাবিরা দাসী-বাদীদের সাথে সঙ্গম করত এমন কি নবীও করত । বিয়ে না করেই এমন করা ইসলামে বৈধ , বর্বর নিয়ম !

বুখারী শরীফ (ইফা) , তাকদীর অধ্যায় , হাদিসের মানঃ সহিহ

৬১৫৯ মাহমূদ ইবন গায়লান (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে ছোট গুনাহ্ সম্পর্কে যা বলেছেন তার চেয়ে যথাযথ উপমা আমি দেখি না। (নবী ﷺ বলেছেন) আল্লাহ্ তা'আলা আদম সন্তানের উপর যিনার কোন না কোন হিস্‌সা লিখে দিয়েছেন; তা সে অবশ্যই পাবে। সুতরাং চোখের যিনা হল (নিষিদ্ধদের প্রতি) নযর করা এবং জিহ্‌বার যিনা হল (যিনা সম্পর্কে) বলা। মন তার আকাঙ্ক্ষা ও কামনা করে, লজ্জাস্থান তাকে বাস্তবায়িত করে অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। শাবাবা (র)ও .... আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

বুখারী শরীফ (ইফা) , তাকদীর অধ্যায় , হাদিসের মানঃ সহিহ

৬১৬৫ আলী ইব্‌ন হাফ্‌স ও বিশ্‌র ইব্‌ন মুহাম্মদ (র).......... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইব্‌ন সাইয়্যাদকে একদা বললেন ঃ আমি (একটি কথা আমার অন্তঃকরণে) তোমার জন্য গোপন রেখেছি। সে বললো, তা হচ্ছে (কল্পনার) ধূম্রজাল মাত্র। নবী ﷺ বললেন ঃ চুপ কর, তুমি তো তোমার তাক্‌দীরকে কখনও অতিক্রম করতে পারবে না। এতদ্‌শ্রবণে উমর (রা) বললেন, আমাকে অনুমতি দিন আমি তার মুণ্ডপাত করে দেই। তিনি বললেন ঃ রাখ একে, এ যদি তাই হয় তবে তুমি তার ওপর (এ কাজে) সক্ষম হবে না। আর যদি তা না হয় তাহলে তাকে হত্যা করার মাঝে তোমার জন্য কোন কল্যাণ নেই।

অর্থাৎ , তাকদীরকে অতিক্রম করা যায় না । আর সাহাবি উমর মানুষের মুন্ডপাত করার জন্য একেবারে যেন মরিয়া তামিল ভিলেন !

বুখারী শরীফ (ইফা) , তাকদীর অধ্যায় , হাদিসের মানঃ সহিহ

৬১৬৬ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-হানযালী (র)..........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে প্লেগ রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন ঃ এটা হচ্ছে আল্লাহ্‌র এক আযাব। আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তার ওপরই প্রেরণ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা এটা মুসলমানের জন্য রহমতে পরিণত করেছেন। প্লেগাক্রান্ত শহরে কোন বান্দা যদি ধৈর্যধারণ করে এ বিশ্বাস নিয়ে সেখানেই অবস্থান করে, তা থেকে বের না হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য যা ভাগ্যে লিখেছেন তা ব্যতীত কিছুই তাকে স্পর্শ করবে না, তাহলে সে শহীদের সাওয়াব লাভ করবে।

প্লেগ রোগ অমুসলিমদের জন্য আযাব আর মুসলমানদের জন্য রহমত ! হাস্যকর !! এমন কোন মুমিন বান্দা কি আছে যে এই রহমত পাওয়ার জন্য দোয়া চাইবে ? প্লেগে মরলে বিনাযুদ্ধে খালি মাঠেই শহীদ ! এই হাদিসের মেসেজ হল – যত রোগ-দুর্ঘটনাই হোক তা আল্লাই মুমিনদের ভাগ্যে লিখে দেন ।

মুসলিম শরীফ (ইফা) , তাকদীর অধ্যায় , হাদিস দূটির মানঃ সহিহ

৬৪৮৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র ও যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) ... হুযায়ফা ইব্‌ন আসাদ (র) থেকে নবী ﷺ পর্যন্ত উন্নীত সনদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জরায়ুতে চল্লিশ কিংবা পঁয়তাল্লিশ দিন শুক্র স্থির থাকার পর সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করে। এরপর সে বলতে থাকে, হে পরওয়ারদিগার! (সে কি) দুর্ভাগা না ভাগ্যবান? তখন বিষয় দু'টির একটি লিপিবদ্ধ করা হয়। এরপর সে বলতে থাকে, হে পালনকর্তা! সে কি পুরুষ না স্ত্রীলোক? তখন সে দু'টির একটি লিপিবদ্ধ করা হয়। তার আমল, কর্ম অবদান, নিয়তি ও জীবিকা লিপিবদ্ধ করা হয়। এরপর খাতা (নথিটি) গুটিয়ে ফেলা হয়, পরে তাতে কোন সংযোজন করা হয় না এবং বিয়োজনও নয়।

৬৪৮৫. আবূ তাহির আহ্‌মাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ্‌ (র) ... আমির ইব্‌ন ওয়াসিলা (র) আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, হতভাগ্য সেই ব্যক্তি, যে তার মাতৃ উদর থেকে হতভাগ্য (রূপে জন্মগ্রহণ করেছে)। আর ভাগ্যবান ব্যক্তি সে, যে অন্যের কাছ থেকে উপদেশ লাভ করে। এরপর তিনি (আমির ইব্‌ন ওয়াসিলা -র) রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর অন্যতম সাহাবী হুযায়ফা ইব্‌ন আসাদ গিফারী (রা)-এর কাছে এলেন। তখন তিনি তাঁর কাছে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর উক্তি (হাদীস) বর্ণনা করলেন এবং বললেন, আমল ব্যতীত একজন মানুষ কিভাবে দুর্ভাগা (গুনাহ্‌গার) হতে পারে? এরপর তিনি (হুযায়ফা -রা) তাঁকে বললেন, তুমি কি এতে বিস্ময়বোধ করছ? আমি রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন : যখন শুক্রের উপর বিয়াল্লিশ রাত (দিন) অতিবাহিত হয়ে যায় তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা একজন ফেরেশতা পাঠান। সে সেটিকে (শুক্রকে) একটি আকৃতি দান করে, তার কান, চোখ, চামড়া, গোশ্‌ত ও হাড় সৃষ্টি করে দেয়। এরপর সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! সে কি পুরুষ, না স্ত্রীলোক হবে? তখন তোমার রব যা চান নির্দেশ দেন এবং ফেরেশতা (নির্দেশ মুতাবিক) লিপিবদ্ধ করে। এরপর সে বলতে থাকে, হে আমার প্রতিপালক! তার বয়স (কত হবে)? তখন তোমার রব যা চান তাই বলেন এবং সেই মুতাবিক ফেরেশতা লিখে। এরপর সে বলতে থাকে, হে আমার প্রতিপালক! তার জীবিকা কি হবে? তখন তোমার রব তাঁর মর্জি মাফিক মীমাংসা করেন এবং ফেরেশতা তা লিপিবদ্ধ করে। এরপর ফেরেশতা তাঁর হাতে লিপিটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সে তাতে বাড়ায়ও না এবং কমায়ও না।

অর্থাৎ , কাউকে কাউকে আল্লা জরায়ুতেই গুনাগাহগার বানিয়ে দেন যা লেখা থাকে তার তাকদীরে।

মুসলিম শরীফ (ইফা) , তাকদীর অধ্যায় , হাদিসের মানঃ সহিহ

৬৫২৫. আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসলামা ইব্‌ন কা'নাব (র) ..... উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই যে বালকটিকে খিযির (আ) (আল্লাহ্‌র নির্দেশে) হত্যা করেছিলেন সে জন্মগত কাফির ছিল। যদি সে বেঁচে থাকত তাহলে সে তার পিতামাতাকে অবাধ্যতা ও কুফরী কাজে বাধ্য করত।

সহিহ আত-তিরমিজী (তাহক্বীককৃত) , হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী (২০১৩)

৩১৫০। উবাই ইবনু কা'ব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ছেলেটিকে খাযির (আঃ) হত্যা করেন, সে আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত তাক্বদীর মতো (সৃষ্টির সূচনাতেই) কাফির ছিল।

সহীহ ঃ যিলা-লুল জান্নাত (১৯৪, ১৯৫), মুসলিম।

উক্ত হাদিস থেকে আমরা জানলাম , আল্লা মানুষকে জন্মগতভাবেই কাউকে কাফির বানায়। কাফির বানিয়ে তাকে আবার অন্যকে দিয়ে হত্যাও করায়। আল্লাই যদি এসব করে তাহলে কাফিরদের প্রতি এত বিদ্বেষেরই বা কারণ কি ? অযৌক্তিক !

সহিহ আত-তিরমিজী (তাহক্বীককৃত) , হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী (২০১৩)

২১৩৫। আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, উমার (রাঃ) প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমলের ক্ষেত্রে আপনার অভিমত কি? আমরা যেসব কাজ করি তা কি নতুনভাবে ঘটল না আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে? তিনি বললেন ঃ হে খাত্তাবের পুত্র! তা আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে। আর সকলের করণীয় বিষয় সহজ করে রাখা হয়েছে। যারা সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত তারা অবশ্যই সাওয়াবের কাজ সম্পাদন করে আর যারা দুর্ভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত তারা দুর্ভাগ্যজনক কাজই সম্পাদন করে থাকে।

সহীহ, যিলালুল জান্নাহ (১৬১, ১৬৭)।

সহিহ আত-তিরমিজী (তাহক্বীককৃত) , হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী (২০১৩)

২১৪৩। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ কোন কিছুই অন্য কিছুকে সংক্রমণ করতে পারে না। কোন এক মফস্বলের লোক বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! যে উটের লিঙ্গে চর্মরোগ আছে সে তো সব উটকেই

চর্মরোগাক্রান্ত করে ফেলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাহলে প্রথম উটটিকে কে চর্মরোগাক্রান্ত করেছিল? ছোঁয়াচে রোগ বলতে কিছু নেই এবং সফর মাসকেও অশুভ বলে ভাবার মতো কিছু নেই। আল্লাহ তা'আলা সকল প্রাণী সৃষ্টি করেছেন এবং তার জীবনকাল, রিযিক ও বিপদাপদ সবকিছু লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন।

সহীহ, সহীহাহ্ (১১৫২)।

মিশকাতুল মাসাবিহ , হাদিস একাডেমি , হাদিসের মানঃ সহিহ

১১৫। ইবনু আদ্ দায়লামী (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সহাবী উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-এর নিকট পৌছে আমি তাকে বললাম, তাক্বদীর সম্পর্কে আমার মনে একটি সন্দেহ তৈরি হচ্ছে। তাই আপনি আমাকে কিছু হাদীস শুনান যাতে আল্লাহর মেহেরবানীতে আমার মন থেকে (তাক্বদীর সম্পর্কে) এসব সন্দেহ-সংশয় দূরিভূত হয়। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা যদি সমস্ত আকাশবাসী ও দুনিয়াবাসীকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তা দিতে পারেন। এতে আল্লাহ যালিম বলে সাব্যস্ত হবেন না। পক্ষান্তরে তিনি যদি তাঁর সৃষ্টজীবের সকলের প্রতিই রহমাত করেন, তবে তাঁর এ রাহমাত তাদের জন্য সকল 'আমাল হতে উত্তম হবে। সুতরাং তুমি যদি উহুদ পাহাড়সম স্বর্ণও আল্লাহর পথে দান কর, তোমার থেকে তিনি তা গ্রহণ করবেন না, যে পর্যন্ত তুমি তাক্বদীরে বিশ্বাস না করবে এবং যা তোমার ভাগ্যে ঘটেছে তা তোমার কাছ থেকে কক্ষনো দূরে চলে যাবে না– এ কথাও তুমি বিশ্বাস না করবে, আর যা এড়িয়ে গেছে তা কক্ষনো তোমার নিকট আর আসবে না– এ বিশ্বাস স্থাপন করা ব্যতীত যদি তোমার মৃত্যু হয় তবে অবশ্যই তুমি জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

অর্থাৎ , তাকদীরে অবিশ্বাসী জাহান্নামি।

সহিহ আত-তিরমিজী (তাহক্বীককৃত) , হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী (২০১৩)

২১৫৫। আবদুল ওয়াহিদ ইবনু সুলাইম (রাহঃ) বলেন, আমি মক্কায় যাওয়ার পর আতা ইবনু আবী বাবাহ্র সাথে দেখা করলাম এবং তাকে বললাম, হে আবূ মুহাম্মাদ! বাসরায় বসবাসকারীরা তো ভাগ্য সম্পর্কে এ ধরনের অস্বীকারমূলক কথা-বার্তা বলছে। তিনি বললেন, হে বৎস! তুমি কি কুরআন তিলাওয়াত কর? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে সূরা 'যুখরুফ' তিলাওয়াত কর। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তখন এ আয়াত পাঠ করলাম ঃ "হা-মীম। সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ! নিশ্চয়ই আমরা তা অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় কুরআনরূপে, যাতে তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার। তা সংরক্ষিত রয়েছে আমার নিকট একটি মূল কিতাবে, এতো অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন মহান বিজ্ঞানময়" (সূরা ঃ যুখরুফ - ১-৪)।

তিনি প্রশ্ন করেন, তুমি জান, মূল কিতাব কি? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, তা একটি মহাগ্রন্থ যা আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীন সৃষ্টির আগেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তাতে এ কথা লিখা আছে যে, ফিরআউন জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত। আর তাতে এ কথাও লিখা আছে যে, আবূ লাহাবের দুটি হাত ধ্বংস হয়ে গেছে এবং সে নিজেও ধ্বংস হয়েছে। আতা (রাহঃ) বলেন, তারপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম সাহাবী উবাদা ইবনুস সামিত (রাঃ)-এর ছেলে ওয়ালীদের সাথে দেখা করে তাকে প্রশ্ন করি, আপনার পিতা তার মৃত্যুকালে আপনাকে কি কি উপদেশ দিয়ে গেছেন? তিনি বললেন, তিনি আমাকে সামনে ডেকে বললেন, হে বৎস! আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর আর জেনে রাখ, যে পর্যন্ত তুমি আল্লাহ্ তা'আলার উপর বিশ্বাস না আনবে এবং ভাগ্য ও তার ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস না আনবে তুমি সে পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার ভয় অর্জন করতে সক্ষম হবে না। এ বিশ্বাস ব্যতীত তোমার মৃত্যু হলে তুমি জাহান্নামী হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে তাকে আদেশ করেন ঃ লিখ। কলম বলল, কি লিখব? তিনি বললেন ঃ তাক্বদীর লিখ, যা হয়েছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত যা হবে সবকিছুই।

সহীহ, সহীহাহ্ (১৩৩) তাখরীজুত্ ত্বাহাবীয়াহ (২৩২), মিশকাত

এই যদি হয় তাকদীরের খেলা তাহলে ফিরাউন আর আবু লাহাবের কাফের না হয়ে উপায় কি ? তাহলে এদের দুজনকে যে মুমিনকুল সকাল সন্ধ্যায় গালি দেয় , প্রকারান্তরে কি তারা আল্লার ফয়সালাকেই গালি দিচ্ছে না ?

সুনান ইবনু মাজাহ , তাওহীদ পাবলিকেশন্স , হাদিসের মানঃ সহিহ

১০/৮৫। ০(আলী বিন মুহাম্মাদ)(আবূ মুআবিয়াহ)(দাঊদ বিন আবূ হিনদ)(আমর বিন শুআয়ব)(তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ))(তার দাদা (আবদুল্লাহ বিন আম্‌র ইবনুল আস্র (রাঃ))০ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সহাবীদের নিকট বের হয়ে এলেন। তখন তারা তাকদীর সম্পর্কে বাদানুবাদ করছিল। ফলে রাগে তাঁর চেহারা লাল বর্ণ ধারণ করে, যেন ডালিমের দানা তাঁর মুখমণ্ডলে ছিটিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, তোমাদের কি এ কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে অথবা এর জন্য কি তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে? তোমরাও কুরআনের কতকাংশকে কতকাংশের বিরুদ্ধে পেশ করছো। এ কারণেই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতগণ ধ্বংস হয়েছে। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ বিন আম্‌র (রাঃ) বললেন, আমি এই মাজলিসে উপস্থিত না থাকায় যে লজ্জা পেলাম, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আর কোন মাজলিসে আমি উপস্থিত না হওয়ায় এতটা লজ্জা পাইনি।[৮৩]

সুনান আবু দাউদ , আল্লামা আলবানী একাডেমী , ৫ম খন্ড

৪৬১৩। নাফি' (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সিরিয়াতে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা)-এর এক বন্ধু ছিলেন। তিনি তার সঙ্গে পত্র আদান প্রদান করতেন। একদা তিনি এই মর্মে চিঠি লিখে পাঠালেন, বিশ্বস্ত সূত্রে আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি তাকদীরের কোন বিষয়ে সমালোচনা করেছো। কাজেই এখন হতে তুমি আমাকে লিখবে না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : অচিরেই আমার উম্মাতের মধ্যে এমন এক গোত্রের আবির্ভাব হবে যারা তাকদীরকে অস্বীকার করবে।[৪৬১২]

হাসান।

উক্ত হাদিসের আলোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি , তাকদীর নিয়ে সমালোচনা করায় একজন সাহাবি তার বন্ধুকে চিঠি লিখতে বারণ করে দিলেন । মানে তাদের বন্ধুত্ব খারাপ হয়ে গেল ।

সুনান আবু দাউদ , আল্লামা আলবানী একাডেমী , ৫ম খন্ড

৪৬৯১। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : কাদরিয়াগণ হচ্ছে এ উম্মাতের অগ্নিপূজক। সুতরাং তারা রোগাক্রান্ত হলে তোমরা তাদেরকে দেখতে যাবে না এবং তারা মারা গেলে তাদের জানাযায় উপস্থিত হবে না।[৪৬৯০]

হাসান।

আমরা এর পূর্ববর্তী হাদিসে দেখেছি , তাকদীরে অবিশ্বাসীদের অগ্নিপূজক বলা হয়েছে। কাদারিয়াদেরও একই কারণেই বলা হয় যা আগেই আমরা দেখে এসেছি । এই হাদিসে জানলাম যারা তাকদীর স্বীকার করে না নবী ঐ সকল মানুষ মরে গেলে জানাযাতেও যেতে মানা করেছে ।

এবার আমরা মাওলানা আব্দুর রহীম কর্তৃক সংকলিত একটি হাদিসগ্রন্থ থেকে দেখব

হাদীস শরীফ ১ম খন্ড (খায়রুন প্রকাশনী) , পৃঃ ৮৪-৮৫

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন ঃ একদা আমি নবী করীম (স)-এর পশ্চাতে জন্তুযানে আরোহিত ছিলাম। তখন তিনি বলিলেন ঃ হে বালক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিক্ষা দিতেছি— (১) আল্লাহকে স্মরণ রাখিও, আল্লাহ তোমার রক্ষক হইবেন, (২) আল্লাহ্‌র (দ্বীনের) হিফাযত কর, তাহা হইলে আল্লাহকে বা আল্লাহ্‌র রহমতকে তোমার সম্মুখে দেখিতে পাইবে, (৩) যখন কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করার প্রয়োজন বোধ কর, তখন এক আল্লাহ্‌র নিকট তাহা চাহিও, (৪) যখন কোন সাহায্য পাইতে চাও, তখন আল্লাহ্‌র নিকটই পাইতে চাও (৫) এই কথা মনে রাখিও যে, সমগ্র লোক যদি তোমার উপকার করার জন্য মিলিত-একত্রিত হয়, তবু তাহারা তোমার কোন উপকার করিতে পারিবে না, অবশ্য শুধু এতটুকুই পারিবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। পক্ষান্তরে সকল লোক যদি তোমার ক্ষতি করিবার জন্য একযোগে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যায়, তবুও তাহারা তোমার ততটুকুই ক্ষতি করিতে পারে যতটুকু আল্লাহ্‌র নিকট নির্দিষ্ট রহিয়াছে, তাহার বেশি নয়। — মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী

হাদীসের শেষার্ধে তকদীর বা অদৃষ্টের কথা বলা হইয়াছে। কাহারো উপরকার বা একবিন্দু ক্ষতি হওয়ার ব্যাপারটি মূলত আল্লাহ্‌রই নিকট নির্দিষ্ট রহিয়াছে। এই দুনিয়ার মানুষ ক্ষতি বা লোকসান— যাহা কিছুরই সম্মুখীন হয়, তাহা সবই আল্লাহ্‌র নিকট নির্দিষ্ট যাহা কিছু আছে সেই অনুযায়ী হইয়া থাকে এবং তাহা আল্লাহ্‌র মঞ্জুরীক্রমেই হইয়া থাকে। অতএব দুনিয়ার সকল মানুষ একত্রিত হইয়া কাহারো একবিন্দু উপকার করিতে চাহিলে তাহা শুধু ততটুকু পরিমাণই করা সম্ভব, যতটুকু আল্লাহ্‌র দরবারে নির্দিষ্ট হইয়া আছে; অনুরূপভাবে সমগ্র জাতি মিলিয়াও কাহারো একবিন্দ্র ক্ষতি করিতে চাহিলে তারা ঠিক ততটুকুই করিতে পারিবে, যতটুকু আল্লাহ্‌র দরবারে নির্দিষ্ট রহিয়াছে। মানুষের কি উপকার আর কি ক্ষতি— সব আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারভুক্ত রহিয়াছে। তাহার বিপরীত— বেশি কিংবা কম কিছু হওয়া এই দুনিয়ায় সম্ভব নয়।— বস্তুত ইহাই হইতেছে তকদীর বা অদৃষ্টবাদের মূল কথা। এই কথাকেই যাহারা জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেক-হৃদয় ও মন-আন্তর দিয়া বিশ্বাস করিতে পারে, এই দুনিয়ায় তাহারা এক আল্লাহ ছাড়া আর কাহারো একবিন্দু পরোয়া করে না। তাহারা সকল পার্থিব ভয়-ভীতির উর্ধ্বে উঠিয়া প্রকৃত সত্য দ্বীন-ইসলামকে পূর্ণরূপে কায়েম করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করে, সাধনা ও সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ে। বস্তুত এই তকদীর বিশ্বাস মানুষকে কখনো নিষ্ক্রিয়, আশাহত ও ব্যর্থ মনোরথ করিয়া দেয় না; বরং মানুষকে অত্যধিক সক্রিয় আশাবাদী ও বিদ্যোৎসাহী করিয়া তোলে— সে হয় নির্ভিক ও বীর পুরুষ। যদিও বর্তমানে এই তকদীর বিশ্বাসই গোটা মুসলিম জাতিকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়, অকর্মণ্য ও অপদার্থ করিয়া দিয়াছে এবং তাহা তকদীর সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা গ্রহণের ফলেই হইয়াছে।

এই হাদিস থেকে জানলাম কেউ চাইলেই কারো ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না আল্লার মঞ্জুরি ও লেখা (তাকদীর) ব্যতিত। তাহলে আরবের অমুসলিমরা যে নবীর দাঁত ভেঙে ছিল , মাথা ফাটিয়েছিল , তাদের দেব-দেবীদের গালাগাল করার জন্য মক্কা থেকে বের করে দিয়েছিল এবং এক মহিলা যে বিষ খাইয়েছিল এসব ক্ষতি নিশ্চয় আল্লাই নবীর জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছিল। তাকদীরে বিশ্বাস যে মানুষকে

বাস্তবিকই অপদার্থ করে তোলে তা স্বীকার না করে ইস্লামিস্টদের উপায় নাই ! প্রকৃতপক্ষে , তাকদীর বিষয়টিই একটি অপদার্থ ধারণা যা মানুষের কাজকে অবমূল্যায়ন করে।

হাদীস শরীফ ১ম খন্ড (খায়রুন প্রকাশনী) , পৃঃ ৮৫-৮৭

ইবনুদ্দায়লামী হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন, আমি উবাই ইবনে কাবের নিকট উপস্থিত হইলাম ও বলিলাম ঃ তকদীর সম্পর্কে আমার মনে কিছু সংশয়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

কাজেই আপনি সে সম্পর্কে কিছু বলুন, সম্ভবত আল্লাহ আমার মন হইতে এই সংশয় দূর করিয়া দিবেন (ও এই ব্যাপারে আমার মন সান্ত্বনা লাভ করিবে)। তিনি বলিলেন ঃ শোন, আল্লাহ তা'আলা যদি আসমান ও জমিনের সমস্ত সৃষ্টিকে আযাবে নিক্ষেপ করেন তবে তাহাতে আল্লাহ জালিম (বলিয়া অভিহিত) হইবেন না। আর তিনি যদি এই সমস্তকেই রহমত দানে ধন্য করিয়া দেন, তবে তাঁহার এই রহমত তাহাদের নিজস্ব আমল অপেক্ষা অনেক ভাল হইবে। তোমরা যদি ওহোদের পাহাড় সমান স্বর্ণও আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর, তবে তাহা আল্লাহ্র দরবারে কুবল হইবে না যতক্ষণ না, তুমি তকদীরকে বিশ্বাস করিবে এবং তোমাদের এই পাকা আকীদা হইবে যে, যাহা কিছু তোমার উপর আসিতেছে তাহা হইতে তুমি কোনক্রমেই রেহাই পাইতে পার না! আর যে অবস্থা তোমার উপর আসিবার নয়, তাহা তোমার উপর আসিতে পারে না। তোমরা উহার বিপরীত ধারণা লইয়া যদি মৃত্যুমুখে পতিত হও, তবে নিশ্চয়ই তোমরা দোযখে যাইবে। ইবনুদ্দায়লামী বলেন ঃ উবাই ইবনে কা'বের এই কথা শোনার পর আমি আবদুল্লাহ ইবেন মাসউদের খিদমতে হাযির হইলাম, তখন তিনিও আমাকে এইরূপ কথাই বলিলেন। অতঃপর হুযায়ফার নিকট উপস্থিত হইলাম, তিনিও আমাকে এই কথাই বলিলেন। ইহার পর আমি জায়দ ইবনে সাবিতের নিকট উপস্থিত হইলাম তিনিও এই কথাই রাসূলুল্লাহ (স)-এর তরফ হইতে হাদীস হিসাবে বর্ণনা করিলেন। — মুসনাদে আহমদ, আবূ দাঊদ, ইবনে মাজা

ব্যাখ্যা 'তকদীর' এর শাব্দিক অর্থ পরিমাণ ঠিক করিয়া দেওয়া। আর ইসলামী পরিভাষায় তকদীর হইতেছে একটি ইসলামী আকীদার নাম, যাহাতে এই কথা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিয়া লইতে হয় যে, এই দুনিয়ায় যাহা কিছু হয়, তাহা সবই আল্লাহ তা'আলা পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, আর আল্লাহ যাহা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাহার ব্যতিক্রম হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নয়। এমন কি মানুষ ভবিষ্যতে কি করিবে আর কি করিবে না, এই দুনিয়ায় কাহার শান্তি হইবে আর কাহার অশান্তি, পরকালে কে বেহেশতে যাইবে আর কে দোযখে তাহা সবই আল্লাহ তাআলা পূর্ব হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। বাংলা চলিত ভাষায় ইহাকে আমরা বলি অদৃষ্ট, ভাগ্য, নিয়তি। বস্তুত এই আকীদা ইসলামের ছয়টি মৌল আকীদার মধ্যে অত্যন্ত জরুরী আকীদা।

আলোচ্য হাদীস বর্ণনাকারী ইবনুদ্দায়লামী যেহেতু একজন পাক্কা মুসলমান ছিলেন এবং আল্লাহ্‌র উল্লেখিত ক্ষমতাকে বিশ্বাস করিতেন, সেই জন্য সংশ্লিষ্ট সাহাবায়ে কিরাম সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহার মনস্তাত্ত্বিক এলাজ করিলেন এবং তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তকদীরে বিশ্বাস করা এতই জরুরী যে, কোন ব্যক্তি এই আকীদা না রাখিয়া পাহাড় সমান স্বর্ণ আল্লাহ্‌র পথে দান করিলেও তাহা আল্লাহ্‌র নিকট কবুল হইবে না; বরং সে জাহান্নামে যাইতে বাধ্য হইবে।

অবশ্য এই কথা সত্য যে, একমাত্র ঈমানদার লোকেরাই এইরূপ জওয়াব পাইয়া তকদীর সম্পর্কীয় প্রশ্নে অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া ও সান্তনা লাভ করিয়া থাকেন; কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় প্রভাবান্বিত ও অন্যান্য মতবাদে দীক্ষিত লোকদের মনে এই সম্পর্কে যে সব প্রশ্ন ও ওয়াসওয়াসা জাগ্রত হয়, তাহার জওয়াব সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষায়, স্বতন্ত্র যুক্তি ও টেকনিকে দিতে হইবে।

উক্ত হাদিসে দেখলাম , সাহাবিদের মধ্যেও জগাখিচুড়ি তাকদীর নিয়ে সংশয় জাগত যা স্বাভাবিক । এই রকম উদ্ভট তাকদীর নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে কেবল মুমিনরাই । কারণ , মুমিনরা তো মানুষের বৈশিষ্ট্যের না , উট বৈশিষ্ট্যের ! আর আধুনিক শিক্ষিত মানুষদের যে এই সব আবোলতাবোল কথা বলে বোঝ দেয়া যাবে না তা বুঝেই মোল্লা মশাই সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষা , যুক্তি , টেকনিক অবলম্বন করার পরামর্শ দিয়েছেন !

উট মার্কা মুমিনের হাদিসটি দেখে নিই-

মিশকাত , ৫ম খন্ড , হাদিস একাডেমি , পৃঃ ৬৮০

৫০৮৬-[১৯] মাকহূল (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মু'মিন লোক ঐ উটের মতো ধীরস্থির ও নরম স্বভাবের হয়ে থাকে, যার নাকের মধ্যে রশি লাগানো হয়েছে। যখন সেটাকে টেনে নেয়া হয়, সে টেনে চলে এবং পাথরের উপর বসতে চাইলে সে পাথরের উপরেই বসে পড়ে।

[ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) এ হাদীসটি "মুরসাল" হিসেবে বর্ণনা করেন।][৯৯৫]

ব্যাখ্যা : (اَلْمُؤْمِنُوْنَ هَيِّنُوْنَ لَيِّنُوْنَ كَالْجَمَلِ...) হাদীসটি সম্পর্কে 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্যের সাথে জীবন-যাপন করে। আর তারা সকলে চেষ্টা করে তাদের রবের সন্তুষ্টি অর্জন করার। যেমনিভাবে একটা উট যখন তার নাকে রশি বাধা থাকে তখন তার মালিককে খুশি করার জন্য যেখানে যা করা দরকার সেখানে তাই করে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

[৯৯৫] হাসান : (তিরমিযীতে পাওয়া যায়নি), সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯৩৬।

মুমিনরা উটের মত নাকে ঈমানি দড়ি লাগিয়ে জীবন যাপন করে , তাদের বিচার করার অধিকারই ইসলাম কেড়ে নিয়েছে । তাই এমন অখাদ্য-অযৌক্তিক তাকদীর এরা

গিলে থাকে । এরা শুনে আর মেনে নেয় , বিচার বিবেচনাহীন কানসর্বস্ব ! যা কোরানের এক আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি ।

সূরা বাকারা , আয়াত ২৮৫ (অনুবাদঃ আল বায়ান ফাউন্ডেশন)

285. রাসূল তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর, আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল।	ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦۚ وَقَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ ٢٨٥

আবার আমরা ফিরে আসি তাকদীরের আলোচনায় , আরেকটি হাদিস দেখা যাকঃ-

হাদীস শরীফ ১ম খন্ড (খায়রুন প্রকাশনী) , পৃঃ ৮৮-৮৯

হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই পরিণতির স্থান দোযখে কিংবা বেহেশতে লিখিত ও নির্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। (অর্থাৎ যে দোযখে যাইবে তাহার জন্য দোযখ আর যে বেহেশতে যাইবে তাহার জন্য বেহেশত পূর্ব হইতেই লিখিত ও নির্দিষ্ট হইয়া আছে)। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তাহা হইলে আমরা কি আমাদের অদৃষ্টের লিখনীর উপর ভরসা করিয়া বসিয়া থাকিব ? এবং চেষ্টা-সাধনা ও শ্রম কি ত্যাগ করিব ? নবী করীম (স) উত্তরে বলিলেন ঃ না, আমল করিতে থাক। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তি সেই কাজেরই সুযোগ পায়, যে জন্য তাহার জন্ম হইয়াছে। অতএব যে ব্যক্তি ভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত, সে সৌভাগ্য ও নেক কাজেরই তওফীক লাভ করিয়া থাকে আর যে ব্যক্তি পাপীদের মধ্যে গণ্য, সে নির্মমতা ও বদ কাজের সুযোগ পাইয়া থাকে। অতঃপর রাসূল নিম্ন অর্থের আয়াত তিলাওয়াত করিলেন— যে আল্লাহ্‌র পথে খরচ করিল ও তাকওয়া অবলম্বন করিয়া এবং সত্য ও ভাল কথাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইল (অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াত কবুল করিল) আমরা তাহাকে সুখ-শান্তি ও নিশ্চিন্ততার বেহেশতের জীবন দান করিব। পক্ষান্তরে যে কৃপণতা করিল, অহংকারী ও দুর্বিনীতি হইল এবং সত্য ও ভাল কথা— ঈমানের দাওয়াত— অমান্য করিল, তাহার জন্য আমরা কষ্ট ও কঠিন জীবন— দোযখ-এর দিকে চলা সহক করিয়া দিব। — বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা আলোচ্য হাদীসে বেহেশত-দোযখে যাওয়া না যাওয়া সম্পর্কিত প্রশ্নের জওয়াবে রাসূলে করীম (স) যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারমর্ম এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির শেষ পরিণতি বেহেশত কি দোযখ, তাহা পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট রহিয়াছে— এই কথা যেমন সত্য, অনুরূপভাবে এই কথাও সত্য যে, ভাল কিংবা মন্দাকাজের সাহায্যে সেই চরম পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছার পথও পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। আল্লাহ্র নির্ধারিত তকদীরে একথাও পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট হইয়া আছে যে, যে ব্যক্তি বেহেশতে যাইবে, সে অমুক অমুক সৎ ও নেক আমলের পথের অগ্রসর হইবে, আর যে জাহান্নামে যাইবে, সে তাহার অমুক অমুক পাপ

কাজের কারণে ধ্বংস হইবে। নবী করীম (স)-এর জওয়াবেরও সারমর্ম প্রায় তাহাই যাহা পূর্বোক্ত হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে।

হাদীস শরীফ ১ম খন্ড (খায়রুন প্রকাশনী) , পৃঃ ৯০-৯১

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) সাহাবিগণকে সম্বোধন করিয়া ইরশাদ করিয়াছেন ঃ "হে জনগণ! যাহা কিছু তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী ও জাহান্নামের আগুন হইতে দূরে রাখিতে পারে, তাহার সব বিষয়েই আমি তোমাদেরকে আদেশ দিয়াছি; পক্ষান্তরে যাহা তোমাদেরকে দোযখের নিকটবর্তী ও জান্নাত হইতে দূরে রাখে, তাহা হইতে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করিয়াছি। এই পর্যায়ে হযরত জিবরাইল (আ) আমার কলবে এই কথা জাগাইয়া দিয়াছেন যে, কোন প্রাণীই স্বীয় নির্দিষ্ট পরিমাণ রিযক পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ না করিয়া মরিতে পারে না। অতএব সাবধান! আল্লাহকে ভয় করিতে থাক এবং ধৈর্যসহকারে স্বীয় রিযক তালাশ করিতে

থাক। পূর্ব নির্দিষ্ট পরিমাণ রিযক পাইতে যদি একটু বিলম্ব দেখ, তবে তাহা আল্লাহ্র না-ফরমানী করিয়া লাভ করিতে চেষ্টিত হইও না। কেননা এই কথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্র আয়ত্তাধীন রিযক কেবলমাত্র তাঁহার অনুগত ও হুকুম পালনের মাধ্যমেই হাসিল করা যাইতে পারে।

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছেঃ-

হাদীসটিতে প্রাণীকুলের— বিশেষভাবে মানুষের— রিযক সম্পর্কে এক দৃঢ়তাব্য উক্তি করা হইয়াছে। এই কথার দুইটি দিক ঃ একটি এই যে, প্রত্যেকটি প্রাণীর জন্য রিযক— উহার পরিমাণ— আল্লাহ কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত। কাহারো মনে যেন নিজের রিযক সম্পর্কে একবিন্দু সন্দেহ জাগ্রত না হয়। দ্বিতীয় দিক এই যে, এই পরিমিত ও পূর্ব নির্ধারিত রিযক পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ না করিয়া কাহারো দুনিয়া হইতে চলিয়া যাওয়া সম্ভব নয়। দুর্বল প্রকৃতির মানুষ রিযককে মনে করে কেবলমাত্র মানবীয় চেষ্টা-সাধনা ও শ্রমের অধীন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়। হাদীস স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিতেছে যে, রিযক একান্তভাবে তকদীরের অধীন এবং তাহা সংশয়পূর্ণ নয় বরং নিশ্চিত ও নিঃসন্দেহ। তাহা এতদূর সন্দেহাতীত যে, মৃত্যুর মতো এক সর্বাঙ্গীন নিশ্চিত ও সনির্ধারিত ব্যাপারও নির্দিষ্ট পরিমাণ রিযক গ্রহণের পূর্বে কখনো ঘটিতে পারে না।

মানুষ মনে করে, কেবলমাত্র শ্রম-সাধনা ও চেষ্টা করিয়াই বুঝি রিয্‌ক লাভ করা যাইবে এবং যত বেশি শ্রম করা যাইবে ততবেশি পরিমাণে রিয্‌ক হাসিল করা সম্ভব হইবে। হাদীস বলিতেছে, ইহা মিথ্যা। রিয্‌ক কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র হুকুম ও বিধান পালন করিয়াই লাভ করা যাইতে পারে। এই সম্পর্কে হাদীসের উক্তি হইল ঃ রিয্‌ক হইতেছে আল্লাহ্‌র আয়ত্তাধীন আর তাহাই যখন প্রকৃত ব্যাপার তখন আল্লাহ্‌র নাফরমানী করিয়া রিয্‌ক হাসিল করা কিভাবে সম্ভব হইতে পারে ?

কিন্তু তাই বলিয়া মানুষের চেষ্টা-সাধনা ও শ্রম দ্বারা রিয্‌ক উপার্জন হইতে হাদীসে নিষেধ করা হয় নাই; বরং হারাম উপায়ে রিয্‌ক উপার্জন করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

তাকদীর প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে রিযিক বা জীবিকা তাকদীর অর্থাৎ ভাগ্যেই আল্লা লিখে রেখেছেন তা আবার নিশ্চিত ও নিঃসন্দেহ ! যা আমাদের জন্য নিশ্চিত তার জন্য আবার আপ্রাণ পরিশ্রম করতে হয়, হাস্যকর ! অক্ষয়কুমার দত্তের সমীকরণে প্রার্থনার স্থানে তাকদীর বসিয়ে হিসেব করিঃ-

পরিশ্রম = জীবিকা

বা, পরিশ্রম + তাকদীর = জীবিকা

অর্থাৎ, তাকদীর = ০

বলা চলে , শূন্য ফলের এই তাকদীর দিয়ে আমাদের কিছু যায় আসে না !

বলা হচ্ছে , দুর্বল প্রকৃতির মানুষ জীবিকাকে মনে করে মানবীয় শ্রমের অধীন। এই ধরণের কথা কেবল বাস্তব জ্ঞান বর্জিত ‘উটতুল্য’ অযৌক্তিক মূর্খ মানুষের পক্ষেই বলা সম্ভব। বরঞ্চ, সবল বা দৃঢ় প্রকৃতির মানুষই শ্রমের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহে প্রত্যয়ী। অপরপক্ষে , আত্মপ্রত্যয়হীন অযৌক্তিক মানুষই অপ্রমাণিত স্রষ্টার উদ্ভট তাকদীরের উপর সব শপে দিয়ে মানুষের শ্রমকে অবমূল্যায়ন করে। মানুষ যা ই করুক না কেন , সব কৃতিত্ব স্রষ্টার ঝুলিতে দেওয়া চাই। আর তাই দরকার তাকদীর।

এবার আমরা আক্বীদা বিষয়ক গ্রন্থ শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়ার ১ম খন্ড থেকে তাকদীর সম্পর্কে জেনে নিইঃ-

"প্রত্যেক জিনিসের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ"। *(সূরা কামার: ৪৯)*

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴾

"এবং তিনি প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তার একটি তাক্বদীর বা পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন"। *(সূরা আল-ফুরকান: ২)*

কাফের যেই কুফুরী করে তা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাতেই হয়; কিন্তু তিনি কুফুরীকে পছন্দ করেন না। তিনি সৃষ্টিগত দিক থেকে কুফুরী সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন। কিন্তু দীন হিসাবে পছন্দ করেন না।

আল্লা যা দীন হিসেবে পছন্দ করে না, তা তিনিই ইচ্ছা করে সৃষ্টি করে থাকেন, আহা কৌতুক ! স্পষ্ট বৈপরিত্য ! কিন্তু আল্লার ইচ্ছাতো বাধ্যতামূলক !! (দ্রষ্টব্যঃ সূরা ইউনূসের ৯৯ নং আয়াতের তাফসীরে মাঝহারি) এর পর আক্বীদা গ্রন্থে বলা হচ্ছেঃ-

কাদারীয়া ও মুতাযেলা সম্প্রদায়ের লোকেরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিরোধিতা করেছে।[২৬৮] তারা ধারণা করে যে, আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের থেকে ঈমান সংঘটিত হওয়ার ইচ্ছা করেন। কিন্তু কাফের কুফুরীর ইচ্ছা করে। তারা এমন ধারণা থেকে বাঁচার জন্য এ কথা বলেছে যে, আল্লাহ তা'আলা কুফুরী সৃষ্টির ইচ্ছা করেছেন এবং কুফুরী করার কারণেই শাস্তি দিয়ে থাকেন। আসলে তাদের অবস্থা হলো ঐ লোকের মতো যে উত্তপ্ত বালুর উপর দাড়িয়ে থাকার কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য আগুনে ঝাপ দিয়েছে। কেননা তারা অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর জিনিস থেকে পালিয়ে এসে তার চেয়ে বেশী ক্ষতিকর জিনিসের মধ্যে প্রবেশ করেছে। অর্থাৎ যদি বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা বান্দার কর্মের স্রষ্টা, আর বান্দার কর্মের মধ্যে যেহেতু ভালো-মন্দ উভয়ই রয়েছে, তাহলে আল্লাহ তা'আলার দিকে মন্দের সম্বন্ধ হয়ে যায়। এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তারা বলেছে বান্দার কর্ম বান্দা নিজেই সৃষ্টি করে। এখন যেই সমস্যাটি হলো, তাদের পূর্বেরটির চেয়ে আরো বেশী ভয়াবহ। এতে করে আল্লাহর ইচ্ছার উপর কাফেরের ইচ্ছা জয়লাভ করা আবশ্যক হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেছেন যে, কাফের ঈমান আনয়ন করুক। এ ক্ষেত্রে কাফের যদি ঈমান না আনে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর কাফেরের ইচ্ছা জয়লাভ করেছে। নাউযুবিল্লাহ। কেননা তাদের মতেও আল্লাহ তা'আলা কাফের থেকে ঈমান সংঘটিত হওয়ার ইচ্ছা করেছেন। আর কাফের কুফুরী করার ইচ্ছা করেছে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা বাস্তবায়ন না হয়ে কাফেরের ইচ্ছাই বাস্তবায়ন হয়েছে!! সে সঙ্গে এরূপ বিশ্বাস থেকে একাধিক স্রষ্টাও সাব্যস্ত হয়ে যায়!! এ আক্বীদাহ হচ্ছে সর্বাধিক নিকৃষ্ট

আক্বীদাহ। এ কথার উপর কোনো দলীল নেই। বরং এটি কুরআন ও হাদীছের দলীলের সুস্পষ্ট বিপরীত।

বাকীয়া ইবনুল ওয়ালীদ রহিমাহুল্লাহর হাদীছ থেকে ইমাম আওযাঈর সনদে লালাকায়ী বর্ণনা করেন যে, আমাদের কাছে আলা ইবনুল হাজ্জাজ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন উবাইদ আল-মক্কী, তিনি বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আমাদের কাছে একজন লোক এসেছে, যে তাক্বদীরকে অস্বীকার করে। জবাবে তিনি বললেন, আমাকে দেখিয়ে দাও। তখন তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তারা বললো, আপনি তাকে কী করবেন। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। আমি যদি সক্ষম হই, তাহলে আমি তার নাক কেটে ফেলবো। আমি যদি তার ঘাড় ধরতে পারি, তাহলে তার ঘাড় মটকিয়ে ফেলবো। কেননা আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

كَأَنِّي بِنِسَاءِ بَنِي فِهْرٍ يَطُفْنَ بِالْخَزْرَجِ تَصْطَفِقُ أَلْيَاتُهُنَّ مُشْرِكَاتٍ

"আমি যেন বনী ফিহিরের মহিলাদেরকে দেখছি, তারা মুশরিক অবস্থায় তাদের নিতম্ব নাড়াতে নাড়াতে খাযরাজ গোত্রে বিচরণ করছে"।

তারা এমনভাবে কোমড় নাড়াচ্ছে, যাতে তাদের একজনের নিতম্ব অন্যজনের নিতম্বে লেগে যাচ্ছে। এ হচ্ছে দীন ইসলামের মধ্যে প্রথম শির্ক। আল্লাহর শপথ! তাদের এ নিকৃষ্ট মতবাদ তাদেরকে এ পর্যন্ত নিয়ে ঠেকাবে যে, তারা বলবে আল্লাহ তা'আলা কল্যাণকর বিষয়গুলো সৃষ্টি করেননি, যেমন তারা আল্লাহ তা'আলাকে মন্দের স্রষ্টা মনে করেনি"।[২৬৯]

গ্রন্থকারের কথা, এ হচ্ছে দীন ইসলামের মধ্যে প্রথম শির্ক, এখান থেকে শেষ পর্যন্ত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বক্তব্য।

অর্থাৎ, 'আল্লা মন্দের স্রষ্টা না' বলাটা ইসলামের প্রথম শির্ক !

শির্কের কথাই যখন এলো ; শির্ক নিয়ে আল্লার বাণী কোরানের একটি বৈপরিত্য দেখা যাকঃ

আপনার রব কারো প্রতি যুলুম করে না (সূরা কাহফ : ৪৯)

﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴾

"এবং তিনি প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তার একটি তাক্বদীর বা পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন"। *(সূরা আল-ফুরকান: ২)*

কাফের যেই কুফুরী করে তা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাতেই হয়;

যারা কুফরী করেছে তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী (সূরা বাকারা : ৩৯)

উক্ত আলোচনা থেকে জানলাম , কাফের কুফরী করে আল্লার ইচ্ছাতেই এবং কুফরী করার জন্যই আল্লা সেই কাফেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামে পাঠান । কিন্তু , আল্লা আবার একই কোরানে বলছেন তিনি কারো প্রতি যুলুম করেন না । বাহ , কি সুষম সমস্যা ! কারণ , বৈপরিত্য । আবার এই বৈপরিত্য নিয়ে কি বলা হয়েছে পড়ে নেয়া যাকঃ-

সূরা নিসা , আয়াত ৮২ (অনুবাদঃ আল বায়ান ফাউন্ডেশন)

82. তারা কি কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? আর যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হত, তবে অবশ্যই তারা এতে অনেক বৈপরীত্য দেখতে পেত।	أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

কে জাহান্নামে যাবে , কে কুফরী করবে , কে গুনাহগার হবে এসব আল্লা মাতৃগর্বে থাকতেই বান্দার তাকদীরে লিখে দেন যা আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি ।

আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া'র ১ম খণ্ডের ১৯৭-১৯৮ নং পৃষ্ঠায় বলা হচ্ছেঃ-

আল্লাহ তা'আলা সূরা আনআমের ৩৯ নং আয়াতে বলেন,

﴿مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾

"আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন আবার যাকে চান সত্য সরল পথে পরিচালিত করেন"। এ ছাড়াও আরো অনেক আয়াত রয়েছে যা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা যা কিছু করার ইচ্ছা করেন, তাই হয়। তিনি যা করার ইচ্ছা করেন না, তা হয় না। তার রাজত্বের মধ্যে কিভাবে এমন কিছু হতে পারে, যা তিনি চান না!! ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট এবং

অধিক বড় কাফের আর কে হতে পারে, যে ধারণা করে আল্লাহ তা'আলা কাফেরের পক্ষ হতে ঈমান সংঘটিত হওয়ার ইচ্ছা করেছেন, কিন্তু কাফের কুফুরী করার ইচ্ছা পোষণ করেছে। অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছার উপর কাফেরের ইচ্ছা জয়লাভ করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের কথার অনেক উর্ধ্বে।

অর্থাৎ , আল্লার রাজত্বে মানে পৃথিবীতে সব আল্লার ইচ্ছায় হয় । আর ঐ ব্যক্তিই বড় কাফের যে ধারণা করে আল্লার ইচ্ছার উপরে কেউ ইচ্ছা করে জয়ী হতে পারে !

আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া'র ১ম খণ্ডের ১৭০-১৭১ নং পৃষ্ঠায় বলা হচ্ছেঃ-

মুশরিক, বেদীন, দার্শনিক এবং আরো অনেকেই মুতাকাল্লিমীনদের বিষয়ে বিভ্রান্ত হয়েছে। যারা বলে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির বিস্তারিত অবস্থা সম্পর্কে অবগত নয়, তারাও বিভ্রান্ত হয়েছে। এ সবকিছুই তাক্বদীর অস্বীকার করার মধ্যে শামিল। কাদারীয়ারা সকল বিষয়ের উপর আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা থাকার কথা অস্বীকার করে। তারা মনে করে আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের কর্মসমূহ সৃষ্টি করেন না। বান্দাদের কাজ-কর্মকে তারা আল্লাহর ক্ষমতা ও সৃষ্টি থেকে বের করে দিয়েছে।

তাক্বদীরের বিষয়টি কুরআন, সুন্নাহ এবং উম্মতের ইজমার দলীল দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। যারা তাক্বদীরকে অস্বীকার করে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ঐকমত্যে তারাই ভ্রান্ত কাদারীয়া। কাদরীয়াদের নিন্দায় ছাহাবী এবং তাবেঈদের থেকে যেসব কথা এসেছে, তা দ্বারা এসব লোকই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তাক্বদীরকে অস্বীকারকারী বিদ'আতী লোক উদ্দেশ্য। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে যখন বলা হলো, এক শ্রেণীর লোক রয়েছে, যারা বলে তাক্বদীর বলতে কিছু নেই। সবকিছুই নতুনভাবে হয়। আল্লাহ তা'আলা বান্দার কোনো কাজই পূর্বে নির্ধারণ করেননি। ইবনে উমার বললেন, তাদেরকে বলে দাও যে, আমি তাদের থেকে মুক্ত। তারাও আমাদের থেকে মুক্ত। অর্থাৎ তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

(২) তাক্বদীর বলতে সমস্ত সৃষ্টির পরিমাণ-পরিণতি ও যাবতীয় অবস্থা এবং সৃষ্টির বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য-স্বভাব ইত্যাদি উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য নির্দিষ্ট পরিমাপ ও পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴾ سورة الفرقان:٢

"তিনি প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন তারপর তার একটি তাক্বদীর নির্ধারণ করে দিয়েছেন" *(সূরা আল-ফুরকান ২৫:২)।*

সুতরাং সৃষ্টি করার জন্য পরিমাণ ও পরিমাপ নির্ধারণ করা জরুরী। কোনো জিনিসের তাক্বদীর নির্ধারণ করা অর্থ হলো তার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাপ ও পরিমাণ নির্ধারণ করা। অস্তিত্বে আসার পূর্বেই তার পরিমাপ নির্ধারণ করা দরকার। প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য যেহেতু নির্দিষ্ট একটি পরিমাণ, অবস্থা ও পরিমাপ নির্ধারণ করা হয়েছে, এতে প্রমাণিত হয় যে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির ছোট-বড় সকল অবস্থাই অবগত রয়েছেন। এতে মুতাযেলাদের একটি সম্প্রদায় ভিন্ন মত পোষণ করেছে। তারা বলে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির মৌলিক বিষয়গুলো জানেন। কিন্তু আংশিক বিষয়সমূহ জানেন না।

তাক্বদীর নির্ধারণ করার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির মৌলিক ও আংশিক সবকিছুই জানেন।

এখান থেকে জানলাম , কোন কিছুই নতুন করে হয় না ; সব পূর্বে নির্ধারিত। আর প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য যেহেতু তাকদীর 'নির্ধারণ করা হয়েছে' – এতে প্রমাণিত হয়

আল্লা ছোট বড় সবই জানেন। অনেক অসৎ মুমিন বলার চেষ্টা করে আল্লা শুধু সব জানেন, আগ থেকে কিছু নির্ধারণ করে রাখেনি, যা সম্পূর্ণই মিথ্যা। কারণ, তাকদীর নির্ধারণের কাজটি পূর্বেই সমাপ্ত হয়েছে।

এই তাকদীরসহ ইসলামের আরো কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনার সময় প্রায়ই অজ্ঞ মুমিনরা বলে থাকে –‘আল্লা পরীক্ষা নিচ্ছেন, যেমন শিক্ষক তার ছাত্রের পরীক্ষা নেয়’- এখানে আল্লাকে মানবসুলভ শিক্ষকের সাথে তুলনা করে। চলুন এ নিয়ে জানা যাকঃ-

আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া’র ১ম খণ্ডের ৩৩৫ নং পৃষ্ঠায় বলা হচ্ছেঃ-

আল্লাহ তা‘আলাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা কুফুরী

আল্লাহ তা‘আলাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা কুফুরী। কুরআন সুস্পষ্ট করেই বলে দিয়েছে, {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشُّورى: ١١] “তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই *(সূরা আশ-শূরা:১১)*। ঐদিকে আল্লাহর ছিফাতসমূহকে অস্বীকার করাও কুফুরী। আল্লাহ তা‘আলা বলেন: وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ “তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা” *(সূরা আশ-শূরা:১১)*।

সূরা শুরার ১১ নং আয়াতের তাফসীর (তাফসীরে মাঝহারি ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৪২৭)

এরপর বলা হয়েছে— ‘লাইসা কামিছ্‌লিহী শাইউন’ (কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়)। এখানে ‘মিছাল’ শব্দটি সন্নিবেশিত হয়েছে অতিরিক্তরূপে। এভাবে উদ্দেশ্য দাঁড়িয়েছে— তিনি কোনো কিছুর মতো নন। ‘মিছাল’ এখানে ব্যবহৃত হয়েছে যথাযথ গুরুত্ব আরোপণার্থে। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে— ‘ফাইন্ আমানু বিমিছ্‌লি মা আমানতুম বিহী’ (তারা যদি ইমান আনতো যেরূপ তোমরা ইমান এনেছো)। কারো কারো কাছে ‘কামিছলিহী’ এর ‘কা’ অতিরিক্ত। এভাবে অর্থ দাঁড়ায়— এমন কিছুই নেই, যা তাঁর অনুরূপ। অর্থাৎ তিনি আনুরূপ্যবিহীন।

উক্ত আক্বীদার বই এবং তাফসীরের আলোকে জানলাম, আল্লা কোন কিছুর মত না, আল্লার অনুরুপ কিছু নেই, আল্লা আনুরুপ্যবিহীন। এত স্পষ্ট করে বলার পরও অজ্ঞ ও অসৎ মুমিনগুলো আল্লাকে তারই সৃষ্টি শিক্ষকের সাথে তুলনা দিয়ে বেড়ায়! যা স্পষ্টতই কুফুরী !!

খলিফা উমর ও এক চোরের তাকদীর কাহিনী (ত্বহাবিয়া ১ম খন্ড , পৃঃ ১৯৯ ও ২০০)

এক চোরকে আমীরুল মুমিনীন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর দরবারে উপস্থিত করা হলো। তিনি যখন চোরের হাত কাটার ফায়ছালা প্রদান করলেন, তখন চোর বলতে লাগল, আপনি কি জানেন না সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে?

সুতরাং চুরি করা আমার তাকদীরে ছিল বলেই চুরি করেছি। চোর পাপ কাজের উপর তাক্বদীর দিয়ে দলীল পেশ করল। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তখন বললেন, তুমি তাক্বদীর অনুযায়ী চুরি করেছো আর আমি আল্লাহর তাক্বদীরের ফায়ছালা অনুযায়ীই তোমার হাত কেটে ফেলবো। সুতরাং চোরের হাত কেটে ফেলা হলো। এতে আমরা জানতে পারলাম যে, আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন যে, চোরের হাত কাটা হবে। তিনি যদি চোরের হাত কাটার ইচ্ছা না করতেন (হাত কাটার আদেশ না দিতেন) তাহলে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কখনোই চোরের হাত কাটতেন না।

সুতরাং চোরের হাত কাটাও তাকদীরে নির্ধারিত রয়েছে। চোর যদি বলে চুরি করা নির্ধারিত রয়েছে। হাত কাটার কথা তাকদীরে নেই, তাহলে তাকে বলা হবে, তুমি কিভাবে জানলে তা তাকদীরে নেই? তুমি কি গায়েব সম্পর্কে অবগত আছো? সুতরাং চুরি করার কারণে যেহেতু চোরের হাত কাটা হয়, তাই বুঝা গেলো ইহাও তাকদীরে নির্ধারিত। কেননা আল্লাহর রাজত্বে আল্লাহর তাক্বদীর ও ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কিছুই সংঘটিত হয় না। আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কোনো কিছু হয় বলে বিশ্বাস করা কুফুরী।

এখান থেকে জানলাম , চুরি করা খারাপ কাজ তাও চোরের তাকদীরে লেখা। আবার আল্লার বিধান দিয়ে চোরের সাজা দেয়া ভালো কাজ এটাও তাকদীরে লেখা ছিল। আর আমরা এও জেনেছি যে আল্লার ইচ্ছা ব্যতিত কিছুই হয়না এবং সে ইচ্ছা বাধ্যতামূলক। মাঝখান থেকে বলির পাঠা হল চোর ! তাহলে আবারো প্রশ্ন আসে যৌক্তিকভাবে কর্মের দায় কার ?

এই প্রশ্নের উত্তরে যে ইসলামে সদুত্তর মিলবে তা আশা করা যায় না। আক্বীদা গ্রন্থের ২য় খন্ড থেকে দেখে নিইঃ-

বান্দা প্রকৃত পক্ষেই তার কাজকর্ম সম্পাদন করে; আল্লাহ তা'আলার তার কাজের স্রষ্টাঃ

উপরোক্ত দীর্ঘ আলোচনার সারসংক্ষেপ হচ্ছে, বান্দার কাজ প্রকৃত পক্ষেই তার নিজস্ব কাজ। কিন্তু তা সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তা'আলা। বান্দার কাজের ফলাফলও আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেন। তবে কাজটি সরাসরি আল্লাহ তা'আলা করেন না। সুতরাং কাজ করা এবং কাজের ফলাফল, সৃষ্টি করা এবং সৃষ্টি এগুলোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এই অর্থ ও পার্থক্যের দিকেই শাইখ ইবনে আবীল ইয্ (রঃ) ইঙ্গিত করতে গিয়ে বলেছেন, وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ خَلْقُ اللهِ وَكَسْبٌ مِنَ الْعِبَادِ অর্থাৎ আল্লাহর বান্দারা যে সমস্ত কাজ-কর্ম সম্পাদন করে, সেগুলোর স্রষ্টাও আল্লাহ। বান্দারা শুধু তা অর্জন করে। গ্রন্থকার এখানে الكسب (অর্জন) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। الكسب বলা হয়, বান্দার ঐ কাজকে, যা তার সম্পাদনকারীর জন্য লাভ অথবা ক্ষতি বয়ে আনে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾

"প্রত্যেক ব্যক্তি যে নেকী উপার্জন করেছে তার ফল সে নিজেই ভোগ করবে এবং যে গুনাহ সে অর্জন করেছে, তার প্রতিফলও তার উপরই বর্তাবে"। *(সূরা আল বাকারা: ২৮৬)*

ভালো করে খেয়াল করুনঃ-

১. বান্দার কাজ সৃষ্টি করে আল্লা।

২. আল্লার সৃষ্টি করা সেই কাজ বাস্তবায়ন করে বান্দা। আল্লার ইচ্ছা যেখানে বাধ্যতামূলক।

৩. উক্ত কাজের ফলাফলও সৃষ্টি করা আল্লারই।

৪. সেই কাজ করার পর ফলাফল বর্তায় বান্দার উপর।

বান্দা এখানে ভুক্তভোগি ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লা যে এমন স্বৈরাচারী নীতিতে কাজ করে এটা শনাক্ত করতে পেরেছিল জাবারিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা , তাই আল্লার ইজ্জত বাঁচাতে জাবারিয়াদের পথভ্রষ্ট বলে আখ্যা দিয়েছে 'নাকে দড়ি বাধা উটতুল্য' আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত নামক মুমিনেরা। পক্ষান্তরে, আল্লার ইজ্জত বাঁচাতে মুতাজিলা সম্প্রদায়ের লোকেরা বলত – বান্দার কর্মের স্রষ্টা বান্দা নিজেই। তাতেও দেখা দিল সমস্যা ; স্রষ্টাবীর আল্লা হয়ে পড়ল 'কর্ম' সৃষ্টি থেকে বঞ্চিত ! অবশ্যম্ভাবীভাবে , ইসলামের আল্লা হয়ে উঠল দুমুখো চরিত্রের নায়ক যে সব কিছু

করার কৃতিত্বটুকুও নিতে চায় আবার খারাপটুকু থেকেও নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় । ফলে 'আল্লাই সব করে' – বলা জাবারিয়ারাও হল পথভ্রষ্ট আর 'আল্লা ভালটুকুই শুধু করে' – বলা মুতাজিলারাও হল পথভ্রষ্ট । তাকদীর নির্ধারণ করনেওয়ালা আল্লাপাক এমনই এক চরিত্র যার সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে ভাবতে গেলেই মুমিন বান্দা হয়ে যায় আন্ধা মানে পথভ্রষ্ট । হয় জাবারিয়াদের মত , নইলে মুতাজিলাদের মত । বাদরামী-নোংরামী কর্ম সৃষ্টি করা , সেই নোংরামী কর্ম মানুষকে দিয়ে বাস্তবায়িত করা , তা করার জন্য আবার বান্দাকে দোষী করা – এই চরিত্রের আল্লাপাককে নিয়ে যদি সকাল সন্ধ্যা গাওয়া যায় 'আল্লাপাকের চরিত্র ফুলের মত পবিত্র' তাহলেই হওয়া যাবে পথপ্রাপ্ত । হাদিসের ভাষায় – 'নাকে দড়িবাধা উটতুল্য' পথপ্রাপ্ত ! মুমিনদের জন্য এই হাদিসটাই যথার্থ । কেননা , যুক্তি বুদ্ধি বাস্তবিক জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের পক্ষে তো নাকে লাগাম পড়ানো নির্বোধ জানোয়ার উট হওয়া সম্মানজনক নয় । তাকদীর ধারণাটাই যে একটা সমস্যা এটা নবী মুহাম্মদও তার জীবন কালেই বুঝতে পেরেছিলেন । তাইতো , সাহাবিরা এ নিয়ে চিন্তামগ্ন হলে মুহাম্মদ রাগে লাল হয়ে যেত ! এখনো আল্লার ইজ্জত বাঁচানোর সেই সমস্যা কাটেনি। এখনো তাকদীর বলতে ইসলামের আলেমদের অবস্থা – 'শ্যাম রাখি , না কূল রাখি'।

শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া , ১ম খন্ড , পৃষ্ঠাঃ ২০২

ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি তাক্বদীরের মধ্যে গভীর দৃষ্টি দিয়ে হয়রান হয়েছি। আমি দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দিয়েও হয়রান হয়েছি। পরিশেষে আমি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি যে, তাক্বদীর সম্পর্কে ঐ ব্যক্তিই বেশী অবগত, যে তার গভীরে প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকে। আর তাক্বদীর সম্পর্কে ঐ ব্যক্তিই সবচেয়ে বেশী অজ্ঞ, যে তা সম্পর্কে বেশী বেশী কথা বলে।

অর্থাৎ , তাকদীর সম্পর্কে সে ই বেশি জানে যে জানা থেকে বিরত থাকে । আর সে ই অজ্ঞ যে জানার জন্য , বোঝার জন্য , পরিষ্কার ধারণার জন্য বেশি জানতে চায় ! আজ নানীর বাণীটা মনে পড়ে গেল , নানী বলত –

''আয়েশা , বল শুনলাম আর মানলাম ঈমান থাকবে ঠিক ;

কোরান হাদিস বুঝে পড়লে হবে যে নাস্তিক !''